# আন্ নিসা

## ৪

### নাযিল হওয়ার সময়-কাল ও বিষয়বস্তু

এ সূরাটি কয়েকটি ভাষণের সমষ্টি। সম্ভবত তৃতীয় হিজরীর শেষের দিক থেকে নিয়ে চতুর্থ হিজরীর শেষের দিকে অথবা পঞ্চম হিজরীর প্রথম দিকের সময়–কালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এর বিভিন্ন অংশ নাযিল হয়। যদিও নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না, কোন আয়াত থেকে কোন আয়াত পর্যন্ত একটি ভাষণের অন্তরভুক্ত হয়ে নাযিল হয়েছিল এবং তার নাযিলের সময়টা কি ছিল, তবুও কোন কোন বিধান ও ঘটনার দিকে কোথাও কোথাও এমন সব ইংগিত করা হয়েছে যার সহায়তায় রেওয়ায়াত থেকে আমরা তাদের নাযিলের তারিখ জানতে পারি। তাই এগুলোর সাহায্যে আমরা এসব বিধান ও ইংগিত সম্বলিত এ ভাষণগুলোর মোটামুটি একটা সীমা নির্দেশ করতে পারি।

যেমন আমরা জানি উত্তরাধিকার বন্টন ও এতিমদের অধিকার সম্বলিত বিধানসমূহ ওহোদ যুদ্ধের পর নাযিল হয়। তখন সত্তর জন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। এ ঘটনাটির ফলে মদীনার ছোট জনবসতির বিভিন্ন গৃহে শহীদদের মীরাস কিভাবে বন্টন করা হবে এবং তারা যেসব এতিম ছেলেমেয়ে রেখে গেছেন তাদের স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষণ করা হবে, এ প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এরি ভিত্তিতে আমরা অনুমান করতে পারি, প্রথম চারটি রুকূ' ও পঞ্চম রুকূ'র প্রথম তিনটি আয়াত এ সময় নাযিল হয়ে থাকবে।

যাতুর রিকা'র যুদ্ধে ভয়ের নামায (যুদ্ধ চলা অবস্থায় নামায পড়া) পড়ার রেওয়ায়াত আমরা হাদীসে পাই। এ যুদ্ধটি চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়। তাই এখানে অনুমান করা যেতে পারে, যে ভাষণে (১৫ রুকূ') এ নামাযের নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে সেটি এরি কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়ে থাকবে।

চতুর্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে মদীনা থেকে বনী নযীরকে বহিষ্কার করা হয়। তাই যে ভাষণটিতে ইহুদীদেরকে এ মর্মে সর্বশেষ সতর্কবাণী শুনিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, "আমি তোমাদের চেহারা বিকৃত করে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেবার আগে ঈমান আনো," সেটি এর পূর্বে কোন নিকটতম সময়ে নাযিল হয়েছিল বলে শক্তিশালী অনুমান করা যেতে পারে।

বনীল মুসতালিকের যুদ্ধের সময় পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। আর এ যুদ্ধটি পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। তাই যে ভাষণটিতে (৭ম রুকূ') তায়াম্মুমের কথা উল্লেখিত হয়েছে সেটি এ সময়ই নাযিল হয়েছিল মনে করতে হবে।

## নাযিল হওয়ার কারণ ও আলোচ্য বিষয়

এভাবে সামগ্রিক পর্যায়ে সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়–কাল জানার পর আমাদের সেই যুগের ইতিহাসের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়া উচিত। এর সাহায্যে সূরার আলোচ্য বিষয় অনুধাবন করা সহজসাধ্য হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সে সময় যেসব কাজ ছিল সেগুলোকে তিনটি বড় বড় বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এক, একটি নতুন ইসলামী সমাজ সংগঠনের বিকাশ সাধন। হিজরাতের পরপরই মদীনা তাইয়েবা ও তার আশেপাশের এলাকায় এ সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের পুরাতন পদ্ধতি নির্মূল করে নৈতিকতা, তামাদ্দুন, সমাজরীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা নতুন নীতি–নিয়ম প্রচলনের কর্মতৎপরতা এগিয়ে চলছিল। দুই, আরবের মুশরিক সম্প্রদায়, ইহুদী গোত্রসমূহ ও মুনাফিকদের সংস্কার বিরোধী শক্তিগুলোর সাথে ইসলামের যে ঘোরতর সংঘাত চলে আসছিল তা জারী রাখা। তিন, এ বিরোধী শক্তিগুলোর সকল বাধা উপেক্ষা করে ইসলামের দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকা এবং এ জন্য আরো নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করে সেখানে ইসলামকে বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে যতগুলো ভাষণ অবতীর্ণ হয়, তা সবই এই তিনটি বিভাগের সাথে সম্পর্কিত।

ইসলামের সামাজিক কাঠামো নির্মাণ এবং বাস্তবে এ সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম অবস্থায় যে সমস্ত নির্দেশ ও বিধানের প্রয়োজন ছিল সূরা বাকারায় সেগুলো প্রদান করা হয়েছিল। বর্তমানে এ সমাজ আগের চাইতে বেশী সম্প্রসারিত হয়েছে। কাজেই এখানে আরো নতুন নতুন বিধান ও নির্দেশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য সূরা নিসার এ ভাষণগুলোতে মুসলমানরা কিভাবে ইসলামী পদ্ধতিতে তাদের সামাজিক জীবনধারার সংশোধন ও সংস্কার সাধন করতে পারে তা আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে পরিবার গঠনের নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। বিয়েকে বিধি–নিষেধের আওতাধীন করা হয়েছে। সমাজে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। এতিমদের অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মীরাস বন্টনের নিয়ম–কানুন নির্ধারিত হয়েছে। অর্থনৈতিক লেনদেন পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঘরোয়া বিবাদ মিটাবার পদ্ধতি শিখানো হয়েছে। অপরাধ দণ্ডবিধির ভিত গড়ে তোলা হয়েছে। মদপানের ওপর বিধি–নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাহারাত ও পাক–পবিত্রতা অর্জনের বিধান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ ও বান্দার সাথে একজন সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষের কর্মধারা কেমন হতে পারে, তা মুসলমানদের জানানো হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দলীয় সংগঠন–শৃংখলা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধান দেয়া হয়েছে। আহলি কিতাবদের নৈতিক, ধর্মীয় মনোভাব ও কর্মনীতি বিশ্লেষণ করে মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন পূর্ববর্তী উম্মতদের পদাংক অনুসরণ করে চলা থেকে বিরত থাকে। মুনাফিকদের কর্মনীতির সমালোচনা করে যথার্থ ও খাঁটি ঈমানদারীর এবং ঈমান ও নিফাকের পার্থক্য সূচক চেহারা পুরোপুরি উন্মুক্ত করে রেখে দেয়া হয়েছে।

ইসলাম বিরোধী শক্তিদের সাথে যে সংঘাত চলছিল ওহোদ যুদ্ধের পর তা আরো নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছিল। ওহোদের পরাজয় আশপাশের মুশরিক গোত্রসমূহ, ইহুদী

প্রতিবেশীবৃন্দ ও ঘরের শত্রু বিভীষণ তথা মুনাফিকদের সাহস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। মুসলমানরা সবদিক থেকে বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ একদিকে আবেগময় ভাষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ করলেন এবং অন্যদিকে যুদ্ধাবস্থায় কাজ করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। মদীনায় মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদার লোকেরা সব রকমের ভীতি ও আশংকার খবর ছড়িয়ে হতাশা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। এ ধরনের প্রত্যেকটি খবর দায়িত্বশীলদের কাছে পৌছিয়ে দেবার এবং কোন খবর সম্পর্কে পুরোপুরি অনুসন্ধান না করার আগে তা প্রচার করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার নির্দেশ দেয়া হয়।

মুসলমানদের বারবার যুদ্ধে ও নৈশ অভিযানে যেতে হতো। অধিকাংশ সময় তাদের এমন সব পথ অতিক্রম করতে হতো যেখানে পানির চিহ্নমাত্রও পাওয়া যেতো না। সে ক্ষেত্রে পানি না পাওয়া গেলে ওযু ও গোসল দুয়ের জন্য তাদের তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া হয়। এ ছাড়াও এ অবস্থায় সেখানে নামায সংক্ষেপ করারও অনুমতি দেয়া হয়। আর যেখানে বিপদ মাথার ওপর চেপে থাকে সেখানে সালাতুল খওফ (ভয়কালীন নামায) পড়ার পদ্ধতি শিকিয়ে দেয়া হয়। আরবের বিভিন্ন এলাকায় যেসব মুসলমান কাফের গোত্রগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এবং অনেক সময় যুদ্ধের কবলেও পড়ে যেতো, তাদের ব্যাপারটি ছিল মুসলমানদের জন্য অনেক বেশী পেরেশানির কারণ। এ ব্যাপারে একদিকে ইসলামী দলকে বিস্তারিত নির্দেশ দেয়া হয় এবং অন্যদিকে ঐ মুসলমানদেরকেও সবদিক থেকে হিজরাত করে দারুল ইসলামে সমবেত হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

ইহুদীদের মধ্যে বিশেষ করে বনী নাযীরের মনোভাব ও কার্যধারা অত্যন্ত বিরোধমূলক ও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। তারা সব রকমের চুক্তির খোলাখুলি বিরুদ্ধাচরণ করে ইসলামের শত্রুদের সাথে সহযোগিতা করতে থাকে এবং মদীনায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিছাতে থাকে। তাদের এসব কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদেরকে সর্বশেষ সতর্কবাণী শুনিয়ে দেয়া হয় এরপরই মদীনা থেকে তাদের বহিষ্কারের কাজটি সমাধা করা হয়।

মুনাফিকদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে। কোন্ ধরনের মুনাফিকদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করা হবে, এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই এদের সবাইকে আলাদা আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণীর মুনাফিকদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করতে হবে, তা বলে দেয়া হয়েছে।

চুক্তিবদ্ধ নিরপেক্ষ গোত্রসমূহের সাথে মুসলমানদের কোন ধরনের ব্যবহার করতে হবে, তাও সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে।

মুসলমানদের নিজেদের চরিত্রকে ত্রুটিমুক্ত করাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এ সংঘাত সংঘর্ষে এ ক্ষুদ্র দলটি একমাত্র নিজের উন্নত নৈতিক চরিত্র বলেই জয়লাভ করতে সক্ষম ছিল। এ ছাড়া তার জন্য জয়লাভের আর কোন উপায় ছিল না। তাই

মুসলমানদেরকে উন্নত নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাদের দলের মধ্যে যে কোন দুর্বলতা দেখা দিয়েছে কঠোর ভাষায় তার সমালোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের দিকটিও এ সূরায় বাদ যায়নি। জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় ইসলাম দুনিয়াকে যে নৈতিক ও তামাদ্দুনিক সংশোধনের দিকে আহবান জানিয়ে আসছিল, তাকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করার সাথে সাথে এ সূরায় ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিক এ তিনটি সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধর্মীয় ধারণা–বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র নীতি ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে তাদের সামনে একমাত্র সত্য দীন ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

*হে মানব জাতি! তোমাদের রবকে ভয় করো। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। তারপর তাদের দু'জনার থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।[১] সেই আল্লাহকে ভয় করো যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের হক আদায় করে থাকো এবং আত্মীয়তা ও নিকট সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছেন।*

*এতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দাও।[২] ভালো সম্পদের সাথে মন্দ সম্পদ বদল করো না।[৩] আর তাদের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে গ্রাস করো না। এটা মহাপাপ।*

১. যেহেতু সামনের দিকের আয়াতগুলোতে মানুষের পারস্পরিক অধিকারের কথা আলোচনা করা হবে, বিশেষ করে পারিবারিক ব্যবস্থাপনাকে উন্নত ও সুগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন বর্ণনা করা হবে, তাই এভাবে ভূমিকা ফাঁদা হয়েছে ঃ একদিকে আল্লাহকে ভয় করার ও তাঁর অসন্তোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য জোর তাকীদ করা হয়েছে এবং অন্যদিকে একথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া হয়েছে যে, একজন মানুষ থেকে সমস্ত মানুষের উৎপত্তি এবং রক্ত-মাংস ও শারীরিক উপাদানের দিক দিয়ে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের অংশ।

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۝

*আর যদি তোমরা এতিমদের (মেয়েদের) সাথে বেইনসাফী করার ব্যাপারে ভয় করো, তাহলে যেসব মেয়েদের তোমরা পছন্দ করো তাদের মধ্য থেকে দুই, তিন বা চারজনকে বিয়ে করো।[৪] কিন্তু যদি তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না বলে আশংকা করো, তাহলে একজনকেই বিয়ে করো।[৫] অথবা তোমাদের অধিকারে সেসব মেয়ে আছে তাদেরকে বিয়ে করো।[৬] বেইনসাফীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটিই অধিকতর সঠিক পদ্ধতি।*

"তোমাদের একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" অর্থাৎ প্রথমে এক ব্যক্তি থেকে মানব জাতির সৃষ্টি করেন। অন্যত্র কুরআন নিজেই এর ব্যাখ্যা করে বলেছে যে, সেই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। তাঁর থেকেই এ দুনিয়ায় মানব বংশ বিস্তার লাভ করে।

"সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া।" এ বিষয়টির বিস্তারিত জ্ঞান আমাদের কাছে নেই। সাধারণভাবে কুরআনের তাফসীরকারগণ যা বর্ণনা করেন এবং বাইবেলে যা বিবৃত হয়েছে তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ আদমের পাঁজর থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তালমুদে আর একটু বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে ঃ ডান দিকের ত্রয়োদশ হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু কুরআন মজীদ এ ব্যাপারে নীরব। আর এর সপক্ষে যে হাদীসটি পেশ করা হয় তার অর্থ লোকেরা যা মনে করে নিয়েছে তা নয়। কাজেই কথাটিকে আল্লাহ যেভাবে সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট রেখেছেন তেমনি রেখে এর বিস্তারিত অবস্থা জানার জন্য সময় নষ্ট না করাই ভালো।

২. অর্থাৎ যতদিন তারা শিশু ও নাবালেগ থাকে ততদিন তাদের ধন-সম্পদ তাদের স্বার্থে ব্যয় করো। আর প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যাবার পর তাদের হক তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও।

৩. একটি ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য। এর একটি অর্থ হচ্ছে, হালালের পরিবর্তে হারাম উপার্জন করো না এবং দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, এতিমদের ভালো সম্পদের সাথে নিজেদের খারাপ সম্পদ বদল করো না।

৪. মুফাস্সিরগণ এর তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন ঃ

এক ঃ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ জাহেলী যুগে যেসব এতিম মেয়ে লোকদের অভিভাবকত্বাধীন থাকতো তাদের সম্পদ ও সৌন্দর্যের কারণে অথবা তাদের ব্যাপারে তো উচ্চবাচ্য করার কেউ নেই, যেভাবে ইচ্ছা তাদের দাবিয়ে রাখা

যাবে—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক অভিভাবক নিজেরাই তাদেরকে বিয়ে করতো, তারপর তাদের ওপর জুলুম করতে থাকতো। এরি পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, তোমরা যদি আশংকা করো যে তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে সমাজে আরো অনেক মেয়ে আছে, তাদের মধ্য থেকে নিজের পছন্দমতো মেয়েদেরকে বিয়ে করো। এ সূরার ১৯ রুকূর প্রথম আয়াতটি এ ব্যাখ্যা সমর্থন করে।

দুই ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর ছাত্র ইকরামা এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ জাহেলী যুগে স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে কোন নির্ধারিত সীমা ছিল না। এক একজন লোক দশ দশটি বিয়ে করতো। স্ত্রীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে সংসার খরচ বেড়ে যেতো। তখন বাধ্য হয়ে তারা নিজেদের এতিম ভাইঝি ও ভাগ্নীদের এবং অন্যান্য অসহায় আত্মীয়াদের অধিকারের দিকে হাত বাড়াতো। এ কারণে আল্লাহ বিয়ের জন্য চারটির সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। জুলুম ও বেইনসাফী থেকে বাঁচার পন্থা এই যে, এক থেকে চারটি পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করবে যাতে তাদের সাথে সুবিচার করতে পার।

তিন ঃ সা'ঈদ ইবনে জুবাইর, কাতাদাহ এবং অন্যান্য কোন কোন মুফাস্সির বলেন ঃ এতিমদের সাথে বেইনসাফী করাকে জাহেলী যুগের লোকেরাও সুনজরে দেখতো না। কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির কোন ধারণাই তাদের মনে স্থান পায়নি। তারা যতগুলো ইচ্ছা বিয়ে করতো। তারপর তাদের ওপর জুলুম–অত্যাচার চালাতো ইচ্ছে মতো। তাদের এ ব্যবহারের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, যদি তোমরা এতিমদের ওপর জুলুম ও বেইনসাফী করতে ভয় করে থাকো, তাহলে মেয়েদের সাথেও বেইনসাফী করার ব্যাপারে ভয় করো। প্রথমত চারটির বেশী বিয়েই করো না। আর চারের সংখ্যার মধ্যেও সেই ক'জনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে যাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে।

আয়াতের শব্দাবলী এমনভাবে গ্রথিত হয়েছে, যার ফলে সেখান থেকে এ তিনটি ব্যাখ্যারই সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি একই সংগে আয়াতটির এ তিনটি অর্থই যদি এখানে উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলেও আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এ ছাড়া এর আর একটা অর্থও হতে পারে। অর্থাৎ এতিমদের সাথে যদি এভাবে ইনসাফ না করতে পারো তাহলে যেসব মেয়ের সাথে এতিম শিশু সন্তান রয়েছে তাদেরকে বিয়ে করো।

৫. এ আয়াতের ওপরে মুসলিম ফকীহগণের 'ইজ্মা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে স্ত্রীর সংখ্যা সীমিত করে দেয়া হয়েছে এবং একই সংগে এক ব্যক্তির চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তায়েফ প্রধান গাইলানের ইসলাম গ্রহণ কালে নয়জন স্ত্রী ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে চারজন স্ত্রী রেখে দিয়ে বাকি পাঁচজনকে তালাক দেবার নির্দেশ দেন। এভাবে আর এক ব্যক্তির (নওফল ইবনে মুআবীয়া) ছিল পাঁচজন স্ত্রী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এক স্ত্রীকে তালাক দেবার হুকুম দেন।

এ ছাড়াও এ আয়াতে একাধিক স্ত্রী রাখার বৈধতাকে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবহারের শর্ত সাপেক্ষ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠতার শর্ত পূরণ না করে একাধিক স্ত্রী রাখার বৈধতার সুযোগ ব্যবহার করে সে মূলত আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে। যে স্ত্রী

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا ۝٤ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاۤءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِیْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِیٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِیْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝٥

*আর আনন্দের সাথে (ফরয মনে করে) স্ত্রীদের মোহরানা আদায় করে দাও। তবে যদি তারা নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছায় মোহরানার কিছু অংশ মাফ করে দেয়, তাহলে তোমরা সানন্দে তা খেতে পারো।*[৭]

*আর তোমাদের যে ধন-সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবন ধারণের মাধ্যমে পরিণত করেছেন, তা নির্বোধদের হাতে তুলে দিয়ো না। তবে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করো এবং সদুপদেশ দাও।*[৮]

বা যেসব স্ত্রীর সাথে সে ইনসাফ করে না ইসলামী সরকারের আদালতসমূহ তাদের অভিযোগ শুনে সে ব্যাপারে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

কোন কোন লোক পাশ্চাত্যবাসীদের খৃস্টবাদী ধ্যান-ধারণার প্রভাবে আড়ষ্ট ও পরাজিত মনোভাব নিয়ে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকে যে, একাধিক বিয়ের পদ্ধতি (যা আসলে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে একটি খারাপ পদ্ধতি) বিলুপ্ত করে দেয়াই কুরআনের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু সমাজে এ পদ্ধতির খুব বেশী প্রচলনের কারণে এর ওপর কেবলমাত্র বিধি-নিষেধ আরোপ করেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের কথাবার্তা মূলত নিছক মানসিক দাসত্বের ফলশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। একাধিক স্ত্রী গ্রহণকে মূলগতভাবে অনিষ্টকর মনে করা কোনক্রমেই সঠিক হতে পারে না। কারণ কোন কোন অবস্থায় এটি একটি নৈতিক ও তামাদ্দুনিক প্রয়োজনে পরিণত হয়। যদি এর অনুমতি না থাকে, তাহলে যারা এক স্ত্রীতে তুষ্ট হতে পারে না, তারা বিয়ের সীমানার বাইরে এসে যৌন বিশৃংখলা সৃষ্টিতে তৎপর হবে। এর ফলে সমাজ-সংস্কৃতি-নৈতিকতার মধ্যে যে অনিষ্ট সাধিত হবে তা হবে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনিষ্টকারিতার চাইতে অনেক বেশী। তাই যারা এর প্রয়োজন অনুভব করে কুরআন তাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছে। তবুও যারা মূলগতভাবে একাধিক বিয়েকে একটি অনিষ্টকারিতা মনে করেন, তাদেরকে অবশ্যি এ ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, তারা কুরআনের রায়ের বিরুদ্ধে এ মতবাদের নিন্দা করতে পারেন এবং একে রহিত করারও পরামর্শ দিতে পারেন কিন্তু নিজেদের মনগড়া রায়কে অনর্থক কুরআনের রায় বলে ঘোষণা করার কোন অধিকার তাদের নেই। কারণ কুরআন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একে বৈধ ঘোষণা করেছে। ইশারা ইংগিতেও এর নিন্দায় এমন একটি শব্দ ব্যবহার করেনি, যা থেকে বুঝা যায় যে, সে এর পথ বন্ধ করতে চায়। (আরো বেশী জানার জন্য আমার "সুন্নাতের আইনগত মর্যাদা" গ্রন্থটি পড়ুন)

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ؕ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝٦ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۠ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝٧

*আর এতিমদের পরীক্ষা করতে থাকো, যতদিন না তারা বিবাহযোগ্য বয়সে পৌঁছে যায়।[৯] তারপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে যোগ্যতার সন্ধান পাও, তাহলে তাদের সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করে দাও।[১০] তারা বড় হয়ে নিজেদের অধিকার দাবী করবে, এ ভয়ে কখনো ইনসাফের সীমানা অতিক্রম করে তাদের সম্পদ তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। এতিমদের যে অভিভাবক সম্পদশালী হবে সে যেন পরহেজগারী অবলম্বন করে (অর্থাৎ অর্থ গ্রহণ না করে) আর যে গরীব হবে সে যেন প্রচলিত পদ্ধতিতে খায়।[১১] তারপর তাদের সম্পদ যখন তাদের হাতে সোপর্দ করতে যাবে তখন তাতে লোকদেরকে সাক্ষী বানাও। আর হিসেব নেবার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।*

*মা–বাপ ও আত্মীয়–স্বজনরা যে ধন–সম্পত্তি রেখে গেছে তাতে পুরুষদের অংশ রয়েছে। আর মেয়েদেরও অংশ রয়েছে সেই ধন–সম্পত্তিতে, যা মা–বাপ ও আত্মীয়–স্বজনরা রেখে গেছে, তা সামান্য হোক বা বেশী[১২] এবং এ অংশ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্ধারিত।*

৬. এখানে ক্রীতদাসী বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেসব নারী যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে আসে এবং সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। একথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করার দায়িত্ব পালন করতে না পারলে একজন যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে আনীত বাঁদীকে বিয়ে করো। সামনের দিকে চতুর্থ রুকূ'তে একথাই বলা হয়েছে। অথবা যদি তোমাদের একাধিক স্ত্রীর প্রয়োজন হয়ে

পড়ে এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্বাধীন মেয়েদের বিয়ে করলে তাদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা তোমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে থাকে, তাহলে ক্রীতদাসীদেরকে গ্রহণ করো। কারণ তাদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর তুলনামূলকভাবে কম দায়িত্ব আসবে। (সামনের দিকে ৪৪ টীকায় ক্রীতদাসীদের বিধান সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

৭. হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও কাযী শুরাইহর ফায়সালা হচ্ছে ঃ যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীকে সম্পূর্ণ মোহরানা বা তার অংশবিশেষ মাফ করে দেয় এবং তারপর আবার তা দাবী করে, তাহলে তা আদায় করার জন্য স্বামীকে বাধ্য করা হবে। কেননা তার দাবী করাই একথা প্রমাণ করে যে, সে নিজের ইচ্ছায় মোহরানার সমুদয় অর্থ বা তার অংশবিশেষ ছাড়তে রাজী নয়। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমার "স্বামী–স্ত্রীর অধিকার" বইটির 'মোহরানা' অধ্যায়টি পড়ুন)।

৮. এ আয়াতটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে একটি পরিপূর্ণ বিধান দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে ঃ অর্থ জীবন যাপনের একটি মাধ্যম। যে কোন অবস্থায়ই তা এমন ধরনের অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকদের হাতে তুলে দেয়া উচিত নয়, যারা এ অর্থ–সম্পদের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এবং শেষ পর্যন্ত নৈতিক ব্যবস্থাকেও ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। কোন ব্যক্তির নিজের সম্পদের ওপর তার মালিকানা অধিকার থাকে ঠিকই। কিন্তু তা এত বেশী সীমাহীন নয় যে, যদি সে ঐ সমস্ত অধিকার সঠিকভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা না রাখে এবং তার ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহারের কারণে সামাজিক বিপর্যয় দেখা দেয় তারপরও তার কাছ থেকে ঐ অধিকার হরণ করা যাবে না। মানুষের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা অবশ্যি পূর্ণ হতে হবে। তবে মালিকানা অধিকারের অবাধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যি এ বিধি–নিষেধ আরোপিত হওয়া উচিত যে, এ ব্যবহার নৈতিক ও তামাদ্দুনিক জীবন এবং সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ক্ষতিকর হতে পারবে না। এ বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক সম্পদ–সম্পত্তির মালিককে ক্ষুদ্র পরিসরে এদিকে অবশ্যি নজর রাখতে হবে যে, নিজের সম্পদ সে যার হাতে সোপর্দ করছে সে তা ব্যবহারের যোগ্যতা রাখে কিনা। আর বৃহত্তর পরিসরে এটা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত হতে হবে যে, যারা নিজেদের সম্পদ ব্যবহারের যোগ্যতা রাখে না অথবা যারা অসৎপথে নিজেদের ধন–সম্পদ ব্যবহার করছে, তাদের ধন–সম্পত্তি সে নিজের পরিচালনাধীনে নিয়ে নেবে এবং তাদের জীবন নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেবে।

৯. অর্থাৎ যখন তারা সাবালক হয়ে যেতে থাকে তখন তাদের বুদ্ধি–জ্ঞান কি পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে তা দেখতে হবে এবং তারা নিজেদের বিষয়াদি আপন দায়িত্বে পরিচালনা করার যোগ্যতা কতটুকু অর্জন করেছে সে দিকেও তীক্ষ্ণ পর্যালোচনার দৃষ্টিতে নজর রাখতে হবে।

১০. ধন–সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করার জন্য দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, সাবালকত্ব আর দ্বিতীয়টি যোগ্যতা, অর্থাৎ অর্থ–সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা। প্রথম শর্তটির ব্যাপারে উম্মতের ফকীহগণ একমত। দ্বিতীয় শর্তটির ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির মত হচ্ছে এই যে, সাবালক হবার পরও যদি এতিমের মধ্যে 'যোগ্যতা' না পাওয়া যায়, তাহলে তার অভিভাবককে সর্বাধিক

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَٰمَىٰ وَالْمَسَٰكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ الْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

*ধন–সম্পত্তি ভাগ–বাঁটোয়ারার সময় আত্মীয়–স্বজন, এতিম ও মিসকিনরা এলে তাদেরকেও ঐ সম্পদ থেকে কিছু দিয়ে দাও এবং তাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলো।*[১৩]

*লোকদের একথা মনে করে ভয় করা উচিত, যদি তারা অসহায় সন্তান পিছনে ছেড়ে রেখে যেতো, তাহলে মরার সময় নিজেদের সন্তানদের ব্যাপারে তাদের কতই না আশংকা হতো। কাজেই তাদের আল্লাহকে ভয় করা ও ন্যায়সংগত কথা বলা উচিত। যারা এতিমদের ধন–সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা আগুন দিয়ে নিজেদের পেট পূর্ণ করে এবং তাদেরকে অবশ্যি জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেয়া হবে।*[১৪]

আরো সাত বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তারপর 'যোগ্যতা' পাওয়া যাক বা না যাক সর্বাবস্থায় এতিমকে তার ধন–সম্পদের দায়িত্ব দিয়ে দিতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম শাফেঈ রাহেমাহুমুল্লাহর মতে ধন–সম্পদ এতিমের হাতে সোপর্দ করার জন্য অবশ্যি 'যোগ্যতা' একটি অপরিহার্য শর্ত। সম্ভবত এঁদের মতে এ ব্যাপারে শরীয়াতের বিষয়সমূহের ফায়সালাকারী কাযীর শরণাপন্ন হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। যদি কাযীর সামনে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সংশ্লিষ্ট এতিমের মধ্যে যোগ্যতা পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে তার বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য তিনি নিজেই কোন ভালো ব্যবস্থা করবেন।

১১. অর্থাৎ সম্পত্তি দেখাশুনার বিনিময়ে নিজের পারিশ্রমিক ঠিক ততটুকু পরিমাণ গ্রহণ করতে পারে যতটুকু গ্রহণ করাকে একজন নিরপেক্ষ ও সুবিবেচক ব্যক্তি সংগত বলে মনে করতে পারে। তাছাড়া নিজের পারিশ্রমিক হিসেবে সে যতটুকু গ্রহণ করবে, তা গোপনে গ্রহণ করবে না বরং প্রকাশ্যে নির্ধারিত করে গ্রহণ করবে এবং তার হিসেব রাখবে।

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن
كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا
أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

২ রুকূ'

*তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ*

*পুরুষদের অংশ দু'জন মেয়ের সমান।[১৫] যদি (মৃতের ওয়ারিস) দু'য়ের বেশী মেয়ে হয়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ তাদের দাও।[১৬]*

*আর যদি একটি মেয়ে ওয়ারিশ হয়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তার।*

*যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে, তাহলে তার বাপ–মা প্রত্যেকে সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ পাবে।[১৭]*

*আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং বাপ–মা তার ওয়ারিস হয়, তাহলে মাকে তিন ভাগের একভাগ দিতে হবে।[১৮]*

*যদি মৃতের ভাই–বোনও থাকে, তাহলে মা ছয় ভাগের একভাগ পাবে।[১৯]*

*(এ সমস্ত অংশ বের করতে হবে) মৃত ব্যক্তি যে অসিয়ত করে গেছে তা পূর্ণ করার এবং সে যে ঋণ রেখে গেছে তা আদায় করার পর।[২০]*

*তোমরা জানো না তোমাদের বাপ–মা ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে তোমাদের বেশী নিকটবর্তী। এসব অংশ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ অবশ্যি সকল সত্য জানেন এবং সকল কল্যাণময় ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন।[২১]*

১২. আয়াতে সুস্পষ্টভাবে পাঁচটি আইনগত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক, মীরাস কেবল পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও অধিকার। দুই, যত কমই হোক না কেন মীরাস অবশ্যি বন্টিত হতে হবে। এমন কি মৃত ব্যক্তি যদি এক গজ কাপড় রেখে গিয়ে থাকে এবং তার দশজন ওয়ারিস থাকে, তাহলেও তা ওয়ারিসদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। একজন ওয়ারিস অন্যজনের থেকে যদি তার অংশ কিনে নেয় তাহলে তা আলাদা কথা। তিন, এ আয়াত থেকে একথাও সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মীরাসের বিধান স্থাবর-অস্থাবর, কৃষি-শিল্প বা অন্য যে কোন ধরনের সম্পত্তি হোক না কেন সব ক্ষেত্রে জারী হবে। চার, এ থেকে জানা যায় যে, মীরাসের অধিকার তখনই সৃষ্টি হয় যখন মৃত ব্যক্তি কোন সম্পদ রেখে মারা যায়। পাঁচ, এ থেকে এ বিধানও নির্দিষ্ট হয় যে, নিকটতম আত্মীয়ের উপস্থিতিতে দূরতম আত্মীয় মীরাস লাভ করবে না।

১৩. এখানে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ মীরাস বন্টনের সময় নিকট ও দূরের আত্মীয়রা, নিজের গোত্রের ও পরিবারের গরীব মিসকিন লোকেরা এবং এতিম ছেলেমেয়ে যারা সেখানে উপস্থিত থাকে, তাদের সাথে হৃদয়হীন ব্যবহার করে না। শরীয়াতের বিধান মতে মীরাসে তাদের অংশ নেই ঠিকই কিন্তু একটু ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তাদেরকেও কিছু দিয়ে দাও। সাধারণভাবে এহেন অবস্থায় সংকীর্ণমনা লোকেরা যে ধরনের হৃদয়বিদারক আচরণ করে ও নির্মম কথাবার্তা বলে, তাদের সাথে তেমনটি করো না।

১৪. হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ওহোদ যুদ্ধের পর হযরত সা'দ ইবনে রুবী'র স্ত্রী তাঁর দু'টি শিশু সন্তানকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হন। তিনি বলেন, "হে আল্লাহর রসূল! এরা সা'দের মেয়ে। এদের বাপ আপনার সাথে ওহোদের যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হয়ে গেছেন। এদের চাচা তার সমস্ত সম্পত্তি নিজের আয়ত্বাধীন করে নিয়েছে। এদের জন্য একটি দানাও রাখেনি। এখন বলুন, কে এ (সহায় সম্পত্তিহীনা) মেয়েদেরকে বিয়ে করবে?" তার এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

১৫. মীরাসের ব্যাপারে এটি প্রথম ও প্রধান মৌলিক বিধান যে, পুরুষদের অংশ হবে মেয়েদের দ্বিগুণ। যেহেতু পারিবারিক জীবন ক্ষেত্রে শরীয়াত পুরুষদের ওপর অর্থনেতিক দায়িত্বের বোঝা বেশী করে চাপিয়ে দিয়েছে এবং অনেকগুলো অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে মেয়েদেরকে মুক্তি দিয়েছে, তাই মীরাসের ব্যাপারে মেয়েদের অংশ পুরুষদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম রাখা হবে, এটিই ছিল ইনসাফের দাবী।

১৬. দু'টি মেয়ের ব্যাপারেও এই একই বিধান কার্যকর। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির যদি কোন পুত্রসন্তান না থাকে এবং সবগুলোই থাকে কন্যা সন্তান, কন্যাদের সংখ্যা দুই বা দু'য়ের বেশী হোক না কেন, তারা সমগ্র পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ পাবে। অবশিষ্ট তিনভাগের একভাগ অন্যান্য ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির শুধুমাত্র একটি পুত্র থাকে, তাহলে এ ব্যাপারে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ ফিকাহবিদগণ সবাই এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, অন্যান্য ওয়ারিসদের অনুপস্থিতিতে সে-ই সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবে। আর যদি অন্যান্য ওয়ারিসরাও থাকে, তাহলে তাদের অংশ দিয়ে দেবার পর বাকি সমস্ত সম্পত্তিই সে পাবে।

১৭. অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার বাপ–মা প্রত্যেকে ছয়ভাগের একভাগ পাবে। আর সন্তান যদি সবগুলোই হয় কন্যা বা সবগুলোই পুত্র অথবা পুত্র কন্যা উভয়ই হয় বা একটি পুত্র অথবা একটি কন্যা হয়, তাহলে বাকি তিনভাগের দু'ভাগে এ ওয়ারিসরা শরীক হবে।

১৮. বাপ–মা ছাড়া যদি আর কেউ ওয়ারিস না থাকে তাহলে বাকি তিনভাগের দু'ভাগ বাপ পাবে। অন্যথায় তিনভাগের দু'ভাগে বাপ ও অন্যান্য ওয়ারিসরা শরীক হবে।

১৯. ভাই–বোন থাকলে মায়ের অংশ তিনভাগের এক ভাগের পরিবর্তে ছয় ভাগের একভাগ করে দেয়া হয়েছে। এভাবে মায়ের অংশ থেকে যে ছয় ভাগের এক ভাগ বের করে নেয়া হয়েছে তা বাপের অংশে দেয়া হবে। কেননা এ অবস্থায় বাপের দায়িত্ব বেড়ে যায়। মনে রাখতে হবে, মৃতের বাপ–মা জীবিত থাকলে তার ভাই–বোনরা কোন অংশ পাবে না।

২০. অসিয়তের বিষয়টি ঋণের আগে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ঋণ রেখে মারা যাওয়া কোন জরুরী বিষয় নয়। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করা তার জন্য একান্ত জরুরী। তবে বিধানের গুরুত্বের দিক দিয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, ঋণের স্থান অসিয়তের চাইতে অগ্রবর্তী। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি ঋণ রেখে মারা যায়, তাহলে সর্বপ্রথম তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তা আদায় করা হবে, তারপর অসিয়ত পূর্ণ করা হবে এবং সবশেষে মীরাস বন্টন করা হবে। অসিয়ত সম্পর্কে সূরা বাকারার ১৮২ টীকায় আমি বলেছি, কোন ব্যক্তি তার সমগ্র সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত অসিয়ত করতে পারে। অসিয়তের এই নিয়ম প্রবর্তনের কারণ হচ্ছে এই যে, মীরাসী আইনের মাধ্যমে যেসব আত্মীয়–স্বজন পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন অংশ পায় না, এখান থেকে তাদের যাকে যে পরিমাণ সাহায্য দেবার প্রয়োজন উপলব্ধি করা হয়, তা নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেমন কোন এতিম নাতি বা নাতনী রয়েছে। মৃত পুত্রের কোন বিধবা স্ত্রী কষ্টে জীবন যাপন করছে। অথবা কোন ভাই, বোন, ভাবী, ভাই–পো, ভাগিনেয় বা কোন আত্মীয় সাহায্য–সহায়তা লাভের মুখাপেক্ষী। এ ক্ষেত্রে অসিয়তের মাধ্যমে তাদের জন্য অংশ সংরক্ষণ করা যেতে পারে। আর যদি আত্মীয়দের মধ্যে এমন কেউ না থাকে, তাহলে অন্য হকদারদের জন্য বা কোন জনকল্যাণমূলক কাজে সম্পত্তির অংশ অসিয়ত করা যেতে পারে। সারকথা হচ্ছে এই যে, সম্পদ–সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ বা তার চাইতে কিছু বেশী অংশের ওপর ইসলামী শরীয়াত মীরাসের আইন বলবৎ করেছে। শরীয়াতের মনোনীত ওয়ারিসদের মধ্যে তা বন্টন করা হবে। আর তিন ভাগের এক ভাগ বা তার চেয়ে কিছু কম অংশের বন্টনের দায়িত্বভার নিজের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। নিজের বিশেষ পারিবারিক অবস্থার প্রেক্ষিতে (যা বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে) সে যেভাবে সংগত মনে করবে বন্টন করার জন্য অসিয়ত করে যাবে। তারপর কোন ব্যক্তি যদি তার অসিয়তে জুলুম করে অথবা অন্য কথায় নিজের ইখতিয়ারকে এমন ত্রুটিপূর্ণভাবে ব্যবহার করে যার ফলে কারো বৈধ অধিকার প্রভাবিত হয়, তাহলে এর মীমাংসার দায়িত্ব পরিবারের লোকদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। তারা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এ ত্রুটি সংশোধন করে নেবে অথবা ইসলামী আদালতের কাযীর কাছে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানাবে এবং তিনি অসিয়তের ত্রুটি দূর করে দেবেন।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١١﴾

*তোমাদের স্ত্রীরা যদি নিঃসন্তান হয়, তাহলে তারা যা কিছু ছেড়ে যায় তার অর্ধেক তোমরা পাবে। অন্যথায় তাদের সন্তান থাকলে যে অসিয়ত তারা করে গেছে তা পূর্ণ করার এবং যে ঋণ তারা রেখে গেছে তা আদায় করার পর পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের একভাগ তোমাদের। আর তোমাদের সন্তান না থাকলে তারা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে। অন্যথায় তোমাদের সন্তান থাকলে তোমাদের অসিয়ত পূর্ণ করার ও তোমাদের রেখে যাওয়া ঋণ আদায় করার পর তারা সম্পত্তির আট ভাগের একভাগ পাবে।*[২২]

*আর যদি পুরুষ বা স্ত্রীলোকের (যার মীরাস বন্টন হবে) সন্তান না থাকে এবং বাপ–মাও জীবিত না থাকে কিন্তু এক ভাই বা এক বোন থাকে, তাহলে ভাই ও বোন প্রত্যেকেই ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। তবে ভাই–বোন একজনের বেশী হলে সমগ্র পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের একভাগে তারা সবাই শরীক হবে,*[২৩] *যে অসিয়ত করা হয়েছে তা পূর্ণ করার এবং যে ঋণ মৃত ব্যক্তি রেখে গেছে তা আদায় করার পর যদি তা ক্ষতিকর না হয়।*[২৪] *এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও সহিষ্ণু।*[২৫]

২১. মীরাসে আল্লাহ প্রদত্ত আইনের গভীর তত্ত্ব উপলব্ধি করতে যারা সক্ষম নয়, এ ব্যাপারে যাদের জ্ঞান অজ্ঞতার পর্যায়ভুক্ত এবং যারা নিজেদের অপরিপক্ক বুদ্ধির সাহায্যে

(তাদের জ্ঞান অনুযায়ী) আল্লাহর এ আইনের ত্রুটি দূর করতে চায়, তাদেরকে এ জবাব দেয়া হয়েছে।

২২. অর্থাৎ একজন স্ত্রী হোক বা একাধিক তাদের যদি সন্তান থাকে তাহলে তারা আট ভাগের একভাগ এবং সন্তান না থাকলে চার ভাগের এক ভাগ পাবে। আর এ চার ভাগের এক ভাগ বা আট ভাগের এক ভাগ সকল স্ত্রীর মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হবে।

২৩. অবশিষ্ট ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ বা তিন ভাগের দু'ভাগ থেকে অন্য কোন ওয়ারিস থাকলে তার অংশ পাবে। অন্যথায় অবশিষ্ট ঐ সমস্ত সম্পত্তি ঐ ব্যক্তি অসিয়ত করতে পারবে।

এ আয়াতের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, এখানে মা–শরীক ভাই–বোনের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মৃতের সাথে তার আত্মীয়তা কেবলমাত্র মায়ের দিক থেকে এবং তাদের বাপ আলাদা। আর সহোদর এবং বৈমাত্রের ভাই–বোনের ব্যাপারে, মৃতের সাথে বাপের দিক থেকে যাদের আত্মীয়তা, তাদের সম্পর্কিত বিধান এ সূরার শেষের দিকে বিবৃত হয়েছে।

২৪. অসিয়ত যদি এমনভাবে করা হয় যে, তার মাধ্যমে হকদার আত্মীয়দের হক নষ্ট হয়, তাহলে এ ধরনের অসিয়ত হয় ক্ষতিকর। আর নিছক হকদারদেরকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি যখন অনর্থক নিজের ওপর এমন কোন ঋণের স্বীকৃতি দেয়, যা সে প্রকৃতপক্ষে নেয়নি, অথবা হকদারকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে এমনি কোন কূটচাল চালে, সে ক্ষেত্রে এ ধরনের ঋণও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের ক্ষতিকারক বিষয়কে কবীরা গোনাহ গণ্য করা হয়েছে। তাই হাদীসে বলা হয়েছে, অসিয়তের ক্ষেত্রে অন্যকে ক্ষতি করার প্রবণতা বড় গোনাহের অন্তরভূক্ত। অন্য একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষ তার সারা জীবন জান্নাতবাসীদের মতো কাজ করতে থাকে কিন্তু মরার সময় অসিয়তের ক্ষেত্রে অন্যের ক্ষতি করার ব্যবস্থা করে নিজের জীবনের আমলনামাকে এমন কাজের মাধ্যমে শেষ করে যায়, যা তাকে জাহান্নামের অধিকারী করে দেয়। এ ক্ষতি করার প্রবণতা ও অন্যের অধিকার হরণ যদিও সর্বাবস্থায় গোনাহ তবুও 'কালালাহ'–এর (যে নিসন্তান ব্যক্তির বাপ–মাও জীবিত নেই) ব্যাপারে মহান আল্লাহ বিশেষ করে এর উল্লেখ এ জন্য করেছেন যে, যে ব্যক্তির সন্তানাদি নেই আবার বাপ–মাও জীবিত নেই, তার মধ্যে সাধারণত নিজের সম্পদ–সম্পত্তি নষ্ট করার প্রবণতা কোন না কোনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং সে দূরবর্তী আত্মীয়দেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা চালায়।

২৫. আল্লাহর জ্ঞানের কথা উচ্চারণ করার পেছনে এখানে দু'টি কারণ রয়েছে। এক, যদি এ আইন ও বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় তাহলে মানুষ আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। দুই, আল্লাহ যে অংশ যেভাবে নির্ধারণ করেছেন তা একেবারেই নির্ভুল। কারণ যে বিষয়ে মানুষের কল্যাণ ও সুবিধা তা মানুষের চেয়ে আল্লাহ ভালো জানেন। এই সংগে আল্লাহর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা গুণের কথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এ আইন প্রবর্তনের ব্যাপারে আল্লাহ কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। বরং তিনি এমন নীতি–নিয়ম প্রবর্তন করেছেন যা মেনে চলা মানুষের জন্য অত্যন্ত সহজ এবং এর ফলে মানুষ কোন কষ্ট, অভাব ও সংকীর্ণতার মুখোমুখি হবে না।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۳﴾ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ص وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۱۴﴾

*এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তাকে আল্লাহ এমন বাগীচায় প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানি করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে যাবে, তাকে আল্লাহ আগুনে ফেলে দেবেন। সেখানে সে থাকবে চিরকাল, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমানজনক শাস্তি।*[২৫ক]

২৫ ক. যারা আল্লাহ রচিত মীরাস আইন পরিবর্তন করে অথবা আল্লাহ তাঁর কিতাবে অন্যান্য যে সমস্ত আইনগত সুস্পষ্ট সীমা নির্ধারণ করেছেন সেগুলো ভেঙে ফেলে, তাদের জন্য এ আয়াতে চিরন্তন আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে। এ দিক দিয়ে এটি একটি অত্যন্ত ভীতি সৃষ্টিকারী আয়াত। কিন্তু বড়ই আফসোসের সাথে বলতে হয়, এমন মারাত্মক ভীতি প্রদর্শন করার পরও মুসলমানরা পুরোপুরি ইহুদীদের কায়দায় নির্লজ্জভাবে আল্লাহর আইনে পরিবর্তন সাধন করেছে এবং তার সীমারেখা ভেঙে ফেলার দুঃসাহস দেখিয়েছে। এ মীরাস আইনের ব্যাপারে যে নাফরমানি করা হয়েছে তা আল্লাহর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহের শামিল। কোথাও মেয়েদেরকে স্থায়ীভাবে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কোথাও কেবলমাত্র বড় ছেলেকে মীরাসের হকদার গণ্য করা হয়েছে। কোথাও কুরআন নির্ধারিত মীরাস বন্টন পদ্ধতি পুরোপুরি পরিহার করে "যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি" (Joint family System) হিসেবে একে ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও মেয়েদের ও পুরুষদের অংশ সমান করে দেয়া হয়েছে। আর বর্তমানে এসব পুরাতন বিদ্রোহের সাথে নতুন আর একটা বিদ্রোহ যোগ হয়েছে। সেটি হচ্ছে, মুসলিম রাষ্ট্রে পাশ্চাত্যবাসীদের অনুকরণে মৃত্যুকর (Death Duty) প্রবর্তন করা হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্র এবং সরকারও মৃতের একজন ওয়ারিস। তার অংশ নির্ধারণ করতে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ ভুলে গিয়েছিলেন। অথচ ইসলামী নীতির ভিত্তিতে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সরকারের হাতে পৌঁছার একটাই মাত্র পথ। আর তা হচ্ছে, মৃতের যদি কোন নিকটতম বা দূরতম আত্মীয় না থাকে, তাহলে তার যাবতীয় পরিত্যক্ত সম্পত্তি Unclaimed Properties–এর মতো রাষ্ট্রের বাইতুলমালে দাখিল হয়ে যাবে। অথবা মৃত ব্যক্তি তার সম্পত্তির একটা অংশ সরকারের নামে অসিয়ত করে গেলে সরকার তা পেতে পারে।

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾

রুকূ' ৩

*তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী নিয়ে এসো। আর চার জন সাক্ষ্য দিয়ে যাবার পর তাদেরকে (নারীদের) গৃহে আবদ্ধ করে রাখো, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু এসে যায় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পথ বের করে দেন। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা (দু'জন) এতে লিপ্ত হবে তাদেরকে শাস্তি দাও। তারপর যদি তারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। কেননা আল্লাহ বড়ই তাওবা কবুলকারী ও অনুগ্রহশীল।*[২৬]

২৬. এ দু'টি আয়াতে যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতটি শুধুমাত্র যিনাকারী মহিলা সম্পর্কিত। সেখানে তার শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাকে দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত বন্দী করে রাখো। দ্বিতীয় আয়াতটিতে যিনাকারী পুরুষ ও যিনাকারী মহিলা উভয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদের উভয়কে কষ্ট দাও। অর্থাৎ উভয়কে মারধর করো, কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা ও নিন্দা করো এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করো। যিনা সম্পর্কে এটা ছিল প্রাথমিক বিধান। পরবর্তী পর্যায়ে সূরা নূরের আয়াত নাযিল হয়। সেখানে পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য একই নির্দেশ দেয়া হয়। বলা হয়, তাদেরকে একশো করে বেত্রাঘাত করো। সে সময় পর্যন্ত আরববাসীরা যেহেতু কোন নিয়মিত সরকারের অধীনে থাকতে এবং আদালতী আইনের আনুগত্য করতে অভ্যস্ত ছিল না, তাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই একটি অপরাধ দণ্ডবিধি তৈরী করে তখনই সেখানে তার প্রবর্তন করা কোনক্রমেই বুদ্ধিমানের কাজ হতো না। মহান আল্লাহ তাদেরকে ধীরে ধীরে অপরাধ দণ্ডবিধিতে অভ্যস্ত করার জন্য প্রথমে যিনা সম্পর্কিত এ শাস্তি নির্ধারণ করেন। তারপর পর্যায়ক্রমে যিনা, যিনার অপবাদ ও চুরির শাস্তি নির্ধারণ করেন। অবেশেষে এরি ভিত্তিতে দণ্ডবিধি সম্পর্কিত বিস্তারিত আইন প্রণীত হয় এবং তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে সমগ্র ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবর্তিত ছিল।

এ আয়াত দু'টির বাহ্যিক পার্থক্য কুরআনের প্রখ্যাত তাফসীরকার সুদ্দীকে বিভ্রান্ত করেছে। তিনি মনে করেছেন, প্রথম আয়াতটি নাযিল হয়েছে বিবাহিত মহিলাদের জন্য

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

*তবে একথা জেনে রাখো, আল্লাহর কাছে তাওবা কবুল হবার অধিকার এক মাত্র তারাই লাভ করে যারা অজ্ঞতার কারণে কোন খারাপ কাজ করে বসে এবং তারপর অতি দ্রুত তাওবা করে। এ ধরনের লোকদের প্রতি আল্লাহ আবার তাঁর অনুগ্রহের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের খবর রাখেন, তিনি জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ। কিন্তু তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা খারাপ কাজ করে যেতেই থাকে, এমন কি তাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে গেলে সে বলে, এখন আমি তাওবা করলাম। অনুরূপভাবে তাওবা তাদের জন্যও নয় যারা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত কাফের থাকে। এমন সব লোকদের জন্য তো আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি।*[২৭]

এবং দ্বিতীয় আয়াতটি অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলাদের জন্য। কিন্তু এটি একটি দুর্বল ব্যাখ্যা। এর সমর্থনে কোন শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ নেই। আর এর চাইতেও দুর্বল কথা লিখেছেন আবু মুসলিম ইসফাহানী। তিনি লিখেছেন, প্রথম আয়াতটি নারীর সাথে নারীর অবৈধ সম্পর্ক এবং দ্বিতীয় আয়াতটি পুরুষের সাথে পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক প্রসংগে নাযিল হয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার, আবু মুসলিমের ন্যায় জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তির দৃষ্টি কেমন করে এ সত্যটি অনুধাবন করতে অক্ষম হলো যে, কুরআন মানব জীবনের জন্য আইন ও নৈতিকতার রাজপথ তৈরী করে। কুরআন কেবলমাত্র সেই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করে যেগুলো রাজপথে সংগঠিত হয়। গলিপথ ও পায়ে চলার সরু পথের দিকে দৃষ্টি দেয়া এবং সেখানে যেসব ছোটখাট ও খুঁটিনাটি সমস্যা সৃষ্টি হয় সেগুলো সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো মোটেই শাহী কালামের উপযোগী নয়। কুরআন এ ধরনের বিষয় ও সমস্যাগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে ইজতিহাদের ওপর। ইজতিহাদের মাধ্যমে এগুলোর সমাধান নির্ণয় করতে হবে। এ কারণেই দেখা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর যখন এ প্রশ্ন দেখা দিল যে পুরুষে পুরুষে অবৈধ সম্পর্কের জন্য কি শাস্তি দেয়া যায়, তখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে একজনও সূরা নিসার এ আয়াতটির মধ্যে এর বিধান রয়েছে বলে মনে করেননি।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

*হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা মোটেই হালাল নয়।[২৮] আর তোমরা যে মোহরানা তাদেরকে দিয়েছো তার কিছু অংশ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আত্মসাৎ করাও তোমাদের জন্য হালাল নয়। তবে তারা যদি কোন সুস্পষ্ট চরত্রহীনতার কাজে লিপ্ত হয় (তাহলে অবশ্যি তোমরা তাদেরকে কষ্ট দেবার অধিকারী হবে)[২৯] তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো। যদি তারা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়, তাহলে হতে পারে একটা জিনিস তোমরা পছন্দ করো না কিন্তু আল্লাহ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।[৩০]*

২৭. তাওবার অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা। গোনাহ করার পর বান্দার আল্লাহর কাছে তাওবা করার অর্থ হচ্ছে এই যে, যে দাসটি তার প্রভুর নাফরমান ও অবাধ্য হয়ে প্রভুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সে এখন নিজের কার্যকলাপে অনুতপ্ত। সে প্রভুর আনুগত্য করার ও তাঁর হুকুম মেনে চলার জন্য ফিরে এসেছে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার দিকে তাওবা করার মানে হচ্ছে এই যে, দাসের ওপর থেকে প্রভুর যে অনুগ্রহ দৃষ্টি সরে গিয়েছিল তা আবার নতুন করে তার প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে। মহান আল্লাহ এ আয়াতে বলেন, আমার এখানে ক্ষমার দরজা একমাত্র সেইসব বান্দার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে, যারা ইচ্ছা করে নয় বরং অজ্ঞতার কারণে ভুল করে বসে এবং চোখের ওপর থেকে অজ্ঞতার পর্দা সরে গেলে লজ্জিত হয়ে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়। এহেন বান্দা তার ভুল বুঝতে পেরে যখনই প্রভু মহান রব্বুল আলামীনের দিকে ফিরে আসবে তখনই নিজের জন্য তাঁর দরজা উন্মুক্ত দেখতে পাবে ঃ

ایں درگہ ما درگہ نومیدی نیست
صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

"আমার এ দরবারে আশাভংগ হয় না কারো
শতবার ভেঙেছো তাওবা, তবু তুমি ফিরে এসো।"

কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় না করে সারা জীবন বেপরোয়াভাবে গোনাহ করতে থাকে তারপর ঠিক যখন মৃত্যুর ফেরেশতা সামনে এসে দাঁড়ায় তখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা

চাইতে থাকে, তাদের জন্য কোন তাওবা নেই, তাদের গোনাহের কোন ক্ষমা নেই। এ বিষয়টিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْ غَرْ

"আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করতে থাকেন যতক্ষণ মৃত্যুর আলামত দেখা না দেয়।" কারণ পরীক্ষার সময় উত্তীর্ণ হবার এবং জীবন গ্রন্থের সব পাতা শেষ হয়ে যাবার পর এখন আর ফিরে আসার সুযোগটাই বা কোথায়? এভাবে কোন ব্যক্তি যখন কুফরীর অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় এবং পরবর্তী জীবনের সীমানায় প্রবশে করে নিজের চোখেই সবকিছু প্রত্যক্ষ করে, দুনিয়ায় সে যাকিছু ভেবে এসেছিল এখন দেখছে আসল ব্যাপার তার সম্পূর্ণ বিপরীত, তখন তার ক্ষমা চাওয়ার কোন সুযোগই তো আর থাকে না।

২৮. এর অর্থ হচ্ছে, স্বামীর মৃত্যুর পর তার পরিবারের লোকেরা তার বিধবাকে মীরাসী সম্পত্তি মনে করে তার অভিভাবক ও ওয়ারিস হয়ে না বসে। স্বামী মরে গেলে স্ত্রী ইদ্দত পালন করার পর স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা যেতে এবং যাকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারে।

২৯. তাদের চরিত্রহীনতার শাস্তি দেবার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তাদের সম্পদ লুট করে খাবার জন্য নয়।

৩০. অর্থাৎ স্ত্রী যদি সুন্দরী না হয় অথবা তার মধ্যে এমন কোন ত্রুটি থাকে যে জন্য স্বামী তাকে অপছন্দ করে তাহলে এ ক্ষেত্রে স্বামীর তৎক্ষণাৎ হতাশ হয়ে তাকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হওয়া উচিত নয়। যতদূর সম্ভব তাকে অবশ্যি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, স্ত্রী সন্দুরী হয় না ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে অন্যান্য এমন কিছু গুণাবলী থাকে, যা দাম্পত্য জীবনে সুন্দর মুখের চাইতে অনেক বেশী গুরুত্ব লাভ করে। যদি সে তার এই গুণাবলী প্রকাশের সুযোগ পায়, তা হলে তার স্বামী রত্নটি যিনি প্রথম দিকে শুধুমাত্র স্ত্রীর অসুন্দর মুখশ্রী দেখে হতাশ হয়ে পড়ছিলেন, এখন দেখা যাবে তার চরিত্র মাধুর্যে তার প্রেমে আত্মহারা হয়ে পড়ছেন। এমনিভাবে অনেক সময় দাম্পত্য জীবনের শুরুতে স্ত্রীর কোন কোন কথা ও আচরণ স্বামীর কাছে বিরক্তিকর ঠেকে এবং এ জন্য স্ত্রীর ব্যাপারে তার মন ভেঙে পড়ে। কিন্তু সে ধৈর্য ধারণ করলে এবং স্ত্রীকে তার সম্ভাব্য সকল যোগ্যতার বাস্তবায়নের সুযোগ দিলে সে নিজেই অনুধাবন করতে পারে যে, তার স্ত্রীর মধ্যে দোষের তুলনায় গুণ অনেক বেশী। কাজেই দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা মোটেই পছন্দনীয় নয়। তালাক হচ্ছে সর্বশেষ উপায়। একান্ত অপরিহার্য ও অনিবার্য অবস্থায়ই এর ব্যবহার হওয়া উচিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ

অর্থাৎ তালাক জায়েয হলেও দুনিয়ার সমস্ত জায়েয কাজের মধ্যে এটি আল্লাহর কাছে সবচাইতে অপছন্দনীয়।

অন্য একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

*আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী আনার সংকল্প করেই থাকো, তাহলে তোমরা তাকে স্তূপীকৃত সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিয়ো না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট জুলুম করে তা ফিরিয়ে নেবে? আর তোমরা তা নেবেই বা কেমন করে যখন তোমরা পরস্পরের স্বাদ গ্রহণ করেছো এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার নিয়েছে।*[৩১]

*আর তোমাদের পিতা যেসব স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছে, তাদেরকে কোনক্রমেই বিয়ে করো না। তবে আগে যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে।*[৩২] *আসলে এটা একটা নির্লজ্জতাপ্রসূত কাজ, অপছন্দনীয় ও নিকৃষ্ট আচরণ।*[৩৩]

تَزَوَّجُوا وَلَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَالذَّوَّاقَاتِ

"বিয়ে করো এবং তালাক দিয়ো না। কারণ আল্লাহ এমন সব পুরুষ ও নারীকে পছন্দ করেন না যারা ভ্রমরের মতো ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে বেড়ায়।"

৩১. পাকাপোক্ত অংগীকার অর্থ বিয়ে। কারণ এটি আসলে বিশ্বস্ততার একটি মজবুত ও শক্তিশালী অংগীকার ও চুক্তি এবং এরই স্থিতিশীলতা ও মজবুতীর ওপর ভরসা করেই একটি মেয়ে নিজেকে একটি পুরুষের হাতে সোপর্দ করে দেয়। এখন পুরুষটি যদি নিজের ইচ্ছায় এ অংগীকার ও চুক্তি ভংগ করে তাহলে চুক্তি করার সময় সে যে বিনিময় পেশ করেছিল তা ফিরিয়ে নেবার অধিকার তার থাকে না। (সূরা বাকারার ২৫১ টীকাটিও দেখুন।)

৩২. সামাজিক ও তামাদ্দুনিক সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের ভ্রান্ত পদ্ধতিগুলোকে হারাম গণ্য করে সাধারণভাবে কুরআন মজীদে অবশ্যি একথা বলা হয়ে থাকে ঃ "যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে।" এর দু'টি অর্থ হয়। এক, অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতার যুগে তোমরা যে সমস্ত ভুল করেছো, সেগুলো পাকাড়াও করা হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে এই যে, এখন যথার্থ নির্দেশ এসে যাবার পর তোমরা নিজেদের কার্যকলাপ সংশোধন করে নাও

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْأَخِ وَبَنٰتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰتُكُم مِّنَ الرَّضٰعَةِ وَأُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبٰٓئِبُكُمُ الّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ الّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

৪ রুকূ’

*তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা,[৩৪] কন্যা,[৩৫] বোন,[৩৬] ফুফু, খালা, বাতিজি, ভাগিনী[৩৭] ও তোমাদের সেই সমস্ত মাকে যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে এবং তোমাদের দুধ বোন[৩৮] তোমাদের স্ত্রীদের মা[৩৯] ও তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েদেরকে যারা তোমাদের কোলে মানুষ হয়েছে,[৪০]—সেই সমস্ত স্ত্রীদের মেয়েদেরকে যাদের সাথে তোমাদের স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যথায় যদি (শুধুমাত্র বিয়ে হয় এবং) স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে (তাদেরকে বাদ দিয়ে তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করলে) তোমাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না,—এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকেও।[৪১] আর দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করাও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে।[৪২] তবে যা প্রথমে হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[৪৩]*

এবং ভুল ও অন্যায় কাজগুলো পরিহার করো, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করো না। দুই, আগের যুগের কোন পদ্ধতিকে যদি এখন হারাম গণ্য করা হয়ে থাকে, তাহলে তা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঠিক হবে না যে, আগের আইন বা রীতি অনুযায়ী যে কাজ ইতিপূর্বে করা হয়েছে তাকে নাকচ করে দিয়ে তা থেকে উদ্ভূত ফলাফলকে অবৈধ ও তার ফলে যে দায়িত্ব মাথায় চেপে বসেছে তাকে অনিবার্যভাবে রহিত করা হচ্ছে। যেমন এখন বিমাতাকে বিয়ে করা হারাম গণ্য করা হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, এ পর্যন্ত যত লোক এ ধরনের বিয়ে করেছে, তাদের গর্ভজাত সন্তানদেরকে জারজ গণ্য করা হচ্ছে এবং নিজেদের পিতার সম্পদ সম্পত্তিতে তাদের উত্তরাধিকার রহিত করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে যদি লেনদেনের কোন পদ্ধতিকে হারাম গণ্য করা হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ এ নয় যে, এ

পদ্ধতিতে এর আগে যতগুলো লেনদেন হয়েছে, সব বাতিল গণ্য হয়েছে এবং এখন এভাবে কোন ব্যক্তি যে ধন–সম্পদ উপার্জন করেছে তা তার থেকে ফেরত নেয়া হবে অথবা ঐ সম্পদকে হারাম গণ্য করা হবে।

৩৩. ইসলামী আইন মোতাবিক এ কাজটি একটি ফৌজদারী অপরাধ এবং আইন–শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখেন। আবু দাউদ, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমাদে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অপরাধকারীদেরকে মৃত্যুদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার শাস্তি দিয়েছেন। আর ইবনে মাজাহ ইবনে আব্বাস থেকে যে রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন, তা থেকে জানা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে এই সাধারণ নির্দেশটি বর্ণনা করেছিলেন ঃ

مَنْ وَقَعَ عَلٰى ذَاتِ مُحْرِمٍ فَاقْتُلُوْهُ

"যে ব্যক্তি মুহরিম আত্মীয়ের মধ্য থেকে কারো সাথে যিনা করে তাকে হত্যা করো।"

ফিকাহবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আহমাদের মতে এহেন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে এবং তার ধন–সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈর মতে যদি সে কোন মুহরিম আত্মীয়ার সাথে যিনা করে থাকে, তাহলে তাকে যিনার শাস্তি দেয়া হবে আর যদি বিয়ে করে থাকে, তাহলে তাকে কঠিন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে।

৩৪. মা বলতে আপন মা ও বিমাতা উভয়ই বুঝায়। তাই উভয়ই হারাম। এ ছাড়া বাপের মা ও মায়ের মা–ও এ হারমের অন্তরভুক্ত।

যে মহিলার সাথে বাপের অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে সে পুত্রের জন্য হারাম কিনা, এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। প্রথম যুগের কোন কোন ফকীহ একে হারাম বলেন না। আবার কেউ কেউ হারাম বলেছেন। বরং তাদের মতে, বাপ যৌন কামনা সহ যে মহিলার গা স্পর্শ করেছে সে–ও পুত্রের জন্য হারাম। অনুরূপভাবে যে মহিলার সাথে পুত্রের অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, সে বাপের জন্য হারাম কিনা এবং যে পুরুষের সাথে মা বা মেয়ের অবৈধ সম্পর্ক ছিল অথবা পরে হয়ে যায়, তার সাথে বিয়ে করা মা ও মেয়ে উভয়ের জন্য হারাম কিনা, এ ব্যাপারেও প্রথম যুগের ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এ প্রসংগে ফকীহদের আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ। তবে সামান্য চিন্তা করলে একথা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন স্ত্রীলোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, যার ওপর তার পিতার বা পুত্রেরও নজর থাকে অথবা যার মা বা মেয়ের ওপরও তার নজর থাকে, তাহলে এটাকে কখনো সুস্থ ও সৎ সামাজিকতার উপযোগী বলা যেতে পারে না। যে সমস্ত আইনগত চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিবাহ ও অবিবাহ, বিবাহ পূর্ব ও বিবাহ পরবর্তী এবং স্পর্শ ও দৃষ্টিপাত ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য করা হয়, কিন্তু আল্লাহর শরীয়াতের স্বাভাবিক প্রকৃতি তা মেনে নিতে মোটেই প্রস্তুত নয়। সোজা কথায় পারিবারিক জীবনে একই স্ত্রীলোকের সাথে বাপ ও ছেলের অথবা একই পুরুষের সাথে মা ও মেয়ের যৌন সম্পর্ক কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ এবং শরীয়াত একে কোনক্রমেই বরদাশ্‌ত করতে পারে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

مَنْ نَظَرَ اِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ اُمُّهَا وَابْنَتُهَا

"যে ব্যক্তি কোন মেয়ের যৌন অংগের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তার মা ও মেয়ে উভয়ই তার জন্যে হারাম হয়ে যায়।"

তিনি আরো বলেন ঃ

لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَى رَجُلٍ نَظَرَ اِلَى فَرْجِ اِمْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا

"আল্লাহ সেই ব্যক্তির চেহারা দেখাই পছন্দ করেন না, যে একই সময় মা ও মেয়ে উভয়ের যৌনাংগে দৃষ্টিপাত করে।"

এ হাদীসগুলো থেকে শরীয়াতের উদ্দেশ্য দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৩৫. নাতনী ও দৌহিত্রীও কন্যার অন্তরভুক্ত। তবে অবৈধ সম্পর্কের ফলে যে মেয়ের জন্ম হয় সেও হারাম কিনা, এ ব্যাপারে অবশ্যি মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম মালেক (র) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের (র) মতে সেও বৈধ কন্যার মতোই মুহরিম। অন্যদিকে ইমাম শাফেঈর (র) মতে সে মুহরিম নয় অর্থাৎ তাকে বিয়ে করা যায় ; কিন্তু আসলে যে মেয়েটিকে সে নিজে তার নিজেরই ঔরসজাত বলে জানে, তাকে বিয়ে করা তার জন্যে বৈধ, এ চিন্তাটিও সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ বিবেককে ভারাক্রান্ত করে।

৩৬. সহোদর বোন, মা–শরীক বোন ও বাপ–শরীক বোন—তিন জনই সমানভাবে এ নির্দেশের আওতাধীন।

৩৭. এ সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রেও সহোদয় ও বৈমাত্রের বৈপিত্রেয়ের–ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। বাপ ও মায়ের বোন সহোদর, মা–শরীক বা বাপ–শরীক যে পর্যায়েরই হোক না কেন তারা অবশ্যি পুত্রের জন্য হারাম। অনুরূপভাবে ভাই ও বোন সহোদর, মা–শরীক বা বাপ–শরীক যে কোন পর্যায়েরই হোক না কেন তাদের কন্যারা নিজের কন্যার মতই হারাম।

৩৮. সমগ্র উম্মাতে মুসলিমা এ ব্যাপারে একমত যে, একটি ছেলে বা মেয়ে যে স্ত্রীলোকের দুধ পান করে তার জন্য ঐ স্ত্রীলোকটি মায়ের পর্যায়ভুক্ত ও তার স্বামী বাপের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় এবং আসল মা ও বাপের সম্পর্কের কারণে যে সমস্ত আত্মীয়তা হারাম হয়ে যায় দুধ–মা ও দুধ–বাপের সম্পর্কের কারণেও সেসব আত্মীয়তাও তার জন্য হারাম হয়ে যায়। এ বিধানটির উৎসমূলে রয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নির্দেশটি ঃ

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"বংশ ও রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়ে যা হারাম দুধ সম্পর্কের দিক দিয়েও তা হারাম।"

তবে কি পরিমাণ দুধ পানে দুধ সম্পর্কের দিক দিয়ে বিয়ে করা হারাম হয় যায় সে ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেকের মতে যে পরিমাণ দুধ

পান করলে একজন রোযাদাদেরর রোযা ভেঙে যেতে পারে কোন স্ত্রীলোকের সেই পরিমাণ দুধ যদি শিশু পান করে, তাহলে হারামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আহমাদের মতে তিনবার পান করলে এবং ইমাম শাফেঈর মতে পাঁচ বার পান করলে এ হারামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও কোন্ বয়সে দুধ পান করলে বিবাহ সম্পর্ক হারাম হয়ে যায় সে ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে ফকীহগণ নিম্নোক্ত মত পোষণ করেন।

এক ঃ শিশুর মাতৃদুগ্ধ পানের যে স্বাভাবিক বয়স কাল, যখন তার দুধ ছাড়ানো হয় না এবং দুধকেই তার খাদ্য হিসেবে খাওয়ানো হয়, সেই সময়ের মধ্যে কোন মহিলার দুধ পান করলে বিবাহ সম্পর্ক হারাম হয়ে যায়। নয়তো দুধ ছাড়ানোর পর কোন শিশু কোন মহিলার দুধ পান করলে, তা পানি পান করারই পর্যায়ভুক্ত হয়। উম্মে সালমা (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) এ মত পোষণ করেছেন। হযরত আলী (রা) থেকেও এই অর্থে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যুহ্‌রী, হাসান বসরী, কাতাদাহ, ইকরামাহ ও আওযাঈও এ মত পোষণ করেন।

দুই ঃ শিশুর দুই বছর বয়স কালের মধ্যে যে দুধ পান করানো হয় কেবল মাত্র তা থেকেই দুধ সম্পর্ক প্রমাণিত হয়। এটি হযরত উমর (রা), ইবনে মাসউদ (রা), আবু হুরাইয়া (রা) ও ইবনে উমরের (রা) মত। ফকীহগণের মধ্যে ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও সুফিয়ান সাওরী এই মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফারও একটি অভিমত এরি সপক্ষে ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম মালিকও এই মতের সমর্থন করেন। কিন্তু তিনি বলেন ঃ দু'বছর থেকে যদি এক মাস দু' মাস বেশী হয়ে যায় তাহলে তার ওপরও ঐ দুধ পানের সময় কালের বিধান কার্যকর হবে।

তিন ঃ ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম যুফারের বিখ্যাত অভিমত হচ্ছে, দুধপানের মেয়াদ আড়াই বছর এবং এই সময়ের মধ্যে কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে দুধ–সম্পর্ক প্রমাণিত হবে।

চার ঃ যে কোন বয়সে দুধ পান করলে দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে বয়স নয়, দুধই আসল বিষয়। পানকারী বৃদ্ধ হলেও দুধ পানকারী শিশুর জন্য যে বিধান তার জন্যও সেই একই বিধান জারী হবে। হযরত আয়েশা (রা) এ মত পোষণ করেন। হযরত আলী (রা) থেকেও এরি সমর্থনে অপেক্ষাকৃত নির্ভুল অভিমত বর্ণিত হয়েছে। ফকীহদের মধ্যে উরওয়াহ ইবনে যুবাইর, আতা ইবনে রিবাহ, লাইস ইবনে সা'দ ও ইবনে হাযম এই মত অবলম্বন করেছেন।

৩৯. যে মহিলার সাথে শুধুমাত্র বিয়ে হয়েছে তার মা হারাম কি না এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ রাহেমাহুমুল্লাহ তার হারাম হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে হযরত আলীর (রা) মতে কোন মহিলার সাথে একান্তে অবস্থান না করা পর্যন্ত তার মা হারাম হবে না।

৪০. সৎ–বাপের ঘরে লালিত হওয়াই এই ধরনের মেয়ের হারাম হওয়ার জন্য শর্ত নয়। মহান আল্লাহ নিছক এই সম্পর্কটির নাজুকতা বর্ণনা করার জন্য এই শব্দাবলী ব্যবহার

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٢٤﴾

*আর (যুদ্ধের মাধ্যমে) তোমাদের অধিকারভুক্ত হয়েছে এমন সব মেয়ে ছাড়া বাকি সমস্ত সধবাই তোমাদের জন্য হারাম।[৪৪] এ হচ্ছে আল্লাহর আইন। এ আইন মেনে চলা তোমাদের জন্য অপরিহার্য গণ্য করা হয়েছে। এদের ছাড়া বাদ বাকি সমস্ত মহিলাকে অর্থ–সম্পদের মাধ্যমে লাভ করা তোমাদের জন্য হালাল গণ্য করা হয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে, অবাধ যৌন লালসা তৃপ্ত করতে পারবে না। তারপর যে দাম্পত্য জীবনের স্বাদ তোমরা তাদের মাধ্যমে গ্রহণ করো, তার বদলে তাদের মোহরানা ফরয হিসেবে আদায় করো। তবে মোহরানার চুক্তি হয়ে যাবার পর পারস্পরিক রেজামন্দির মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে যদি কোন সমঝোতা হয়ে যায় তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানী।*

করেছেন। এ ব্যাপারে মুসলিম ফকীহগণের প্রায় 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, সৎ–মেয়ে সৎ–বাপের ঘরে লালিত হোক বা না হোক সর্বাবস্থায়ই সে সৎ–বাপের জন্য হারাম।

৪১. এই শর্তটি কেবলমাত্র এ জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যাকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে, তার বিধবা বা তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম নয়। কেবল মাত্র নিজের ঔরস জাত পুত্রের স্ত্রীই বাপের জন্য হারাম। এভাবে পুত্রের ন্যায় প্রপুত্র ও দৌহিত্রের স্ত্রীও দাদা ও নানার জন্য হারাম।

৪২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ, খালা ও ভাগিনী এবং ফুফু ও ভাইঝিকেও এক সাথে বিয়ে করা হারাম। এ ব্যাপারে একটা মূলনীতি মনে রাখা দরকার। সেটি হচ্ছে, এমন ধরনের দু'টি মেয়েকে একত্রে বিয়ে করা হারাম যাদের একজন যদি পুরুষ হতো তাহলে অন্য জনের সাথে তার বিয়ে হারাম হতো।

৪৩. অর্থাৎ জাহেলী যুগে তোমরা জুলুম করতে। দুই বোনকে এক সাথে বিয়ে করতে। সে ব্যাপারে আর জবাবদিহি করতে হবে না। তবে শর্ত হচ্ছে, এখন তা থেকে বিরত থাকতে হবে। (টীকা ৩২ দেখুন) এরি ভিত্তিতে এ নির্দেশ দেয়া হয় যে, যে ব্যক্তি কুফরীর

যুগে দুই সহোদর বোনকে বিয়ে করেছিল তাকে এখন ইসলাম গ্রহণ করার পর এক জনকে রাখতে ও অন্য জনকে ছেড়ে দিতে হবে।

৪৪. অর্থাৎ যেসব মেয়ে যুদ্ধ বন্দিনী হয়ে এসেছে এবং তাদের স্বামীরা দারুল হার্‌বে (ইসলাম বিরোধী ও ইসলামের শত্রুদের শাসিত দেশ) রয়ে গেছে তারা হারাম নয়। কারণ দারুল হার্‌ব থেকে দারুল ইসলামে আসার পর তাদের বিয়ে ভেঙে গেছে। এই ধরনের মেয়েদের বিয়েও করা যায় আবার যাদের মালিকানায় তারা আছে তারা তাদের সাথে সংগমও করতে পারে। তবে স্বামী–স্ত্রী যদি একই সাথে বন্দী হয়ে আসে, তাহলে এ ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের বিধান গৃহীত হবে, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সাথীগণের মতে, তাদের বিয়ে অপরিবর্তিত থাকবে। অন্যদিকে ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈর মতে তাদের বিয়ে অটুট থাকবে না।

যুদ্ধ বন্দিনী দাসীদের সাথে সংগম করার ব্যাপারে বহু রকমের বিভ্রান্তি লোকদের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই এ প্রসংগে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ভালো করে বুঝে নেয়া দরকার।

এক ঃ যে সমস্ত মেয়ে যুদ্ধে বন্দী হয়, তাদেরকে বন্দী করার সাথে সাথেই যে কোন সৈনিক তাদের সাথে সংগম করার অধিকার লাভ করে না। বরং ইসলামী আইন অনুযায়ী এই ধরনের মেয়েদেরকে সরকারের হাতে সোপর্দ করে দেয়া হবে। সরকার চাইলে তাদেরকে বিনাশর্তে মুক্ত করে দিতে পারে, তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করতে পারে, শত্রুর হাতে যেসব মুসলমান বন্দী হয়েছে তাদের সাথে এদের বিনিময়ও করতে পারে এবং চাইলে তাদেরকে সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিতেও পারে। এ ব্যাপারে সরকারের পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে। একজন সৈনিক কেবলমাত্র সরকারের পক্ষ থেকে তাকে যে যুদ্ধ বন্দিনীটি দেয়া হয় তার সাথেই সংগম করতে পারে।

দুই ঃ যে মেয়েটিকে এভাবে কারো মালিকানায় দেয়া হয়, যতক্ষণ না তার একবার মাসিক ঋতুস্রাব হয় এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে, সে গর্ভবতী নয় ততক্ষণ তার সাথে সংগম করা যেতে পারে না। এর আগে তার সাথে সংগম করা হারাম। আর যদি সে গর্ভবতী হয়, তাহলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেও তার সাথে সংগম করা অবৈধ।

তিন ঃ যুদ্ধ বন্দিনীদের সাথে সংগম করার ব্যাপারে তাদের অবশ্যি আহ্‌লি কিতাব হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। তাদের ধর্ম যাই হোক না কেন, যাদের মধ্যে তাদেরকে ভাগ করে দেয়া হবে তারা তাদের সাথে সংগম করতে পারবে।

চার ঃ যে মেয়েকে যার ভাগে দেয়া হবে একমাত্র সেই তার সাথে সংগম করতে পারবে। অন্য কারো তার গায়ে হাত দেবার অধিকার নেই। সেই মেয়ের গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে সে তার মালিকের বৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। শরীয়াতে আপন ঔরসজাত সন্তানের যে অধিকার নির্ধারিত হয়েছে এই সন্তানের আইনগত অধিকারও তাই হবে। সন্তানের জননী হয়ে যাবার পর এই মেয়েকে আর বিক্রি করা যাবে না এবং মালিক মরে যাওয়ার সাথে সাথেই সে মুক্ত হয়ে যাবে।

পাঁচ ঃ যে মেয়েটি এভাবে কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন হয়, তাকে তার মালিক যদি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় তাহলে মালিক তার থেকে অন্য সমস্ত খেদমত নিতে পারবে কিন্তু তার সাথে যৌন সম্পর্ক রাখার অধিকার তার থাকবে না।

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَٰتِ الْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ الْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

*আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির সম্ভ্রান্ত পরিবারের মুসলিম মেয়েদের বিয়ে করার সামর্থ নেই তার তোমাদের অধিকারভুক্ত মু'মিন দাসীদের মধ্য থেকে কাউকে বিয়ে করে নেয়া উচিত। আল্লাহ তোমাদের ঈমানের অবস্থা খুব ভালোভাবেই জানেন। তোমরা সবাই একই দলের অন্তরভুক্ত।[৪৫] কাজেই তাদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে করো এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে তাদের মোহরানা আদায় করো, যাতে তারা বিয়ের আবেষ্টনীর মধ্যে সংরক্ষিত থাকে, অবাধ যৌন লালসা পরিতৃপ্ত করতে উদ্যোগী না হয় এবং লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম না করে বেড়ায়। তারপর যখন তারা বিয়ের আবেষ্টনীর মধ্যে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং এরপর কোন ব্যভিচার করে তখন তাদের জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের জন্য নির্ধারিত শাস্তির অর্ধেক শাস্তি দিতে হবে।[৪৬] তোমাদের মধ্য থেকে সেইসব লোকের জন্য এ সুবিধা[৪৭] সৃষ্টি করা হয়েছে, যাদের বিয়ে না করলে তাকওয়ার বাঁধ ভেঙে পড়ার আশংকা থাকে। তবে সবর করলে তা তোমাদের জন্য ভালো। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।*

ছয় ঃ শরীয়াত স্ত্রীদের সংখ্যার ব্যাপারে যেমন চারজনের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, দাসীদের ব্যাপারে তেমন কোন সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়নি। ধনী লোকেরা বেশুমার বাঁদী কিনে কিনে মহল ভরে ফেলবে এবং বিলাসিতার সাগরে গা ভাসিয়ে দেবে, এটা শরীয়াতের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আসলে যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থাই ছিল এ ব্যাপারে সীমা নির্ধারণ না করার মূলীভূত কারণ।

সাত ঃ সরকার আইনগতভাবে কোন ব্যক্তিকে যুদ্ধবন্দীদের ওপর যে মালিকানা অধিকার দান করেছে মালিকানার অন্যান্য অধিকারের ন্যায় এটিও স্থানান্তর যোগ্য।

আট ঃ বিয়ে যেমন একটি আইনসংগত কাজ তেমনি সরকারের পক্ষ থেকে কাউকে যথারীতি মালিকানা অধিকার দান করাও একটি আইনসংগত কাজ। কাজেই যে ব্যক্তি বিয়ের মধ্যে কোন প্রকার অন্যায় ও অপ্রীতিকর ব্যাপার দেখে না, তার ক্রীতদাসীর সাথে সংগম করার মধ্যে খামাখা কোন অন্যায় ও অপ্রীতিকর বিষয় অনুভব করার পেছনে কোন ন্যায়সংগত কারণ নেই।

নয় ঃ যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে কোন মেয়েকে কারো মালিকানায় দিয়ে দেবার পর পুনর্বার সরকার তাকে ফেরত নেবার অধিকার রাখে না, ঠিক যেমন কোন মেয়ের অভিভাবক তাকে কারো সাথে বিয়ে দেবার পর আবার তাকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার হারিয়ে ফেলে।

দশ ঃ কোন সেনাপতি যদি নিছক সাময়িকভাবে তার সৈন্যদেরকে বন্দিনী মেয়েদের মাধ্যমে নিজেদের যৌন তৃষ্ণা মিটাবার অনুমতি দেয় এবং তাদেরকে সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেয়, তাহলে ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে এটা হবে সম্পূর্ণ একটি অবৈধ কাজ। যিনার সাথে এর কোন পার্থক্য নেই। আর যিনা ইসলামী আইন অনুযায়ী একটি অপরাধ। বিস্তারিত জানার জন্য আমার 'তাফহীমাত' ২য় খণ্ড ও 'রাসায়েল ও মাসায়েল' ১ম খণ্ড দেখুন।

৪৫. অর্থাৎ সমাজ জীবনে মানুষের মধ্যে মর্যাদার যে পার্থক্য দেখা যায় তা নিছক আপেক্ষিক। নয়তো আসলে সব মুসলমান সমান। তাদের মধ্যে যথার্থই পার্থক্য করার মতো যদি কোন বিষয় থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে ঈমান। আর ঈমান কোন উঁচু ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। একজন ক্রীতদাসীও ঈমান ও নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার চাইতেও ভালো হতে পারে।

৪৬. আপাত দৃষ্টিতে এখানে একটি জটিলতা দেখা দেয়। খারেজী ও 'রজম' তথা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর শাস্তি অস্বীকারকারী অন্যান্য লোকেরা এ থেকে সুযোগ গ্রহণ করেছে। তারা বলে ঃ স্বাধীন বিবাহিতা মেয়েদের যিনার শাস্তি ইসলামী শরীয়াতে যদি 'রজম' হয়ে থাকে, তাহলে এর অর্ধেক শাস্তি যা ক্রীতদাসীদেরকে দেয়া হবে, তা কি হতে পারে? কাজেই এই আয়াত একথার চূড়ান্ত সাক্ষ দিচ্ছে যে, ইসলামে রজমের শাস্তিই নেই। কিন্তু তারা আসলে কুরআনের শব্দাবলীর ওপর গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করেনি। এই রুকূ'তে 'মুহসানাত' (সংরক্ষিত মহিলা) শব্দটি দু'টি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হচ্ছে, "বিবাহিতা মহিলা", যারা স্বামীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ করে এবং অন্যটি "সম্ভ্রান্ত মহিলা", যারা বিবাহিতা না হলেও পরিবারের সংরক্ষণ লাভ করে। আলোচ্য আয়াতে 'মুহসানাত' শব্দটি ক্রীতদাসীর মোকাবিলায় সম্ভ্রান্ত মহিলাদের জন্য দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, প্রথম অর্থে নয়। আয়াতে উল্লেখিত বিষয়বস্তু থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে বিপরীতপক্ষে ক্রীতদাসীদের জন্য 'মুহসানাত' শব্দটি প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যখন তারা বিয়ের সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ করবে (فاذا احصن) । কেবলমাত্র তখনই তাদের জন্য যিনা করলে উল্লেখিত শাস্তির ব্যবস্থা

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

*৫ রুকূ'*

*তোমাদের আগে যেসব সৎলোক চলে গেছে, তারা যেসব পদ্ধতির অনুসরণ করতো, আল্লাহ তোমাদের সামনে সেই পদ্ধতিগুলো সুস্পষ্ট করে দিতে এবং সেই সব পদ্ধতিতে তোমাদের চালাতে চান। তিনি নিজের রহমত সহকারে তোমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চান। আর তিনি সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানময়।[৪৮] হ্যাঁ, আল্লাহ তো রহমত সহকারে তোমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চান। কিন্তু যারা নিজেদের প্রবৃত্তির লালসার অনুসরণ করছে তারা চায় তোমরা ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে দূরে চলে যাও।[৪৯] আল্লাহ তোমাদের ওপর থেকে বিধি-নিষেধ হাল্‌কা করতে চান। কারণ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।*

দেয়া হয়েছে। এখন গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে একথা একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সম্ভ্রান্ত মহিলারা দু'টি সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ করে। একটি হচ্ছে, পরিবারের সংরক্ষণ ব্যবস্থা। এর কারণে তারা বিবাহিতা না হয়েও 'মুহসিনা' অর্থাৎ সংরক্ষিত হয়ে যায়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, স্বামীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা। এর ফলে তারা পরিবারের সংরক্ষণের ওপর আর একটা বাড়তি সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ করে। বিপরীত পক্ষে ক্রীতদাসী যতদিন ক্রীতদাসী অবস্থায় থাকে ততদিন সে 'মুহসিনা' নয়। কারণ সে কোন পরিবারের সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ করেনি। তবে হাঁ, বিয়ে হবার পর সে কেবল স্বামীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ করে এবং তাও অসম্পূর্ণ। কারণ স্বামীর সংরক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় আসার পরও তারা মালিকের সেবা ও চাকরী থেকে মুক্তি লাভ করে না এবং সম্ভ্রান্ত মহিলারা সমাজে যে মর্যাদা লাভ করে সে ধরনের মর্যাদাও তারা লাভ করে না। কাজেই তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে তা হবে সম্ভ্রান্ত পরিবারের অবিবাহিতা মেয়েদের শাস্তির অর্ধাংশ, সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিবাহিতা মেয়েদের শাস্তির অর্ধাংশ নয়। এ ছাড়াও এখান থেকে একথাও জানা গেছে যে, সূরা নূর-এর আয়াতে কেবলমাত্র অবিবাহিতা সম্ভ্রান্ত মহিলাদের যিনার শাস্তির কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং এর মোকাবিলায় এখানে বিবাহিতা ক্রীতদাসীদের শাস্তি অর্ধেক বলা হয়েছে। আর বিবাহিতা সম্ভ্রান্ত মহিলারা তো অবিবাহিতা সম্ভ্রান্ত মহিলাদের তুলনায় কঠিন শাস্তি লাভের যোগ্য। কারণ তারা দু'টি সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলে। যদিও কুরআন তাদের ব্যাপারে রজমের শাস্তির বিধান সুস্পষ্ট করেনি তবুও অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে

সেদিকে ইংগিত করেছে। এ বিষয়টি স্থূল বুদ্ধির লোকদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যেতে পারে কিন্তু নবীর সূক্ষ্ম ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির অন্তরালে থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

৪৭. অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করার সামর্থ না থাকলে কোন ক্রীতদাসীর মালিকের অনুমতিক্রমে তাকে বিয়ে করার সুবিধা।

৪৮. সূরার শুরু থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত যে নির্দেশ ও বিধান দেয়া হয়েছে এবং এই সূরা নাযিলের পূর্বে সূরা বাকারায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য যে বিধান দেয়া হয়েছিল সেসবের দিকে সামগ্রিকভাবে একটি ইংগিত করে বলা হচ্ছে, মানব সভ্যতার প্রাচীনতম যুগ থেকে প্রতি যুগের নবীগণ ও তাঁদের সৎ ও সত্যনিষ্ঠ অনুসারীগণ সমাজ, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার এই আইনগুলো কার্যকর করে এসেছেন। আল্লাহ তাঁর অসীম অনুগ্রহের বদৌলতে তোমাদেরকে জাহেলীয়াতের অবস্থা থেকে বের করে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ লোকদের জীবনধারার দিকে পরিচালিত করেছেন।

৪৯. এখানে মুনাফিক, রক্ষণশীল ও প্রাচীন পন্থী মূর্খ এবং মদীনার উপকণ্ঠের ইহুদীদের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। সমাজ ও সংস্কৃতিতে শত শত বছরের পুঞ্জীভূত জাহেলী বংশ ও গোত্রপ্রীতি এবং রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে যে সংস্কার অভিযান চলছিল মুনাফিক ও রক্ষণশীলদের কাছে তা ছিল অত্যন্ত অপ্রীতিকর। তারা এটাকে কোনক্রমেই বরদাশত করতে পারছিল না। মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মেয়েদের অংশ লাভ, শ্বশুর বাড়ির বাঁধন থেকে বিধবাদের মুক্তি পাওয়া এবং ইদ্দত শেষ হবার পর যে কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করার ব্যাপারে তাদের স্বাধীন ক্ষমতা লাভ, সৎ-মাকে বিয়ে করা হারাম হওয়া, দুই বোনকে একই সাথে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করাকে অবৈধ গণ্য করা, পালকপুত্রকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা, পালক পিতার জন্য পালকপুত্রের তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করা হালাল গণ্য করা এবং এই ধরনের আরো অনেক সংস্কারমূলক কার্যাবলীর প্রত্যেকটির ওপর বয়োবৃদ্ধ ও বাপ-দাদার রীতি-রেওয়াজের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরা চীৎকার করে উঠছিল। দীর্ঘদিন থেকে এই বিধানগুলোর বিরুদ্ধে নানান কথাবার্তা চলছিল। দুষ্ট লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংস্কার মূলক দাওয়াতের বিরুদ্ধে এই বিদ্রূপ কথাগুলো ব্যবহার করে লোকদেরকে উত্তেজিত করে চলছিল। যেমন, ইসলামী শরীয়াত যে ধরনের বিয়েকে হারাম গণ্য করছিল তেমনি ধরনের কোন বিয়ের ফলে ইতিপূর্বে যে ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল তাকে এই বলে উত্তেজিত করা হচ্ছিল ঃ "নিন জনাব, আজ যে নতুন বিধান ওখানে এসেছে তার দৃষ্টিতে তো আপনার বাপ ও মায়ের সম্পর্ক অবৈধ গণ্য হয়েছে।" এভাবে সেখানে আল্লাহর বিধানের আওতায় যে সংস্কারমূলক কাজ হচ্ছিল এই নির্বোধ লোকেরা তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল।

অন্যদিকে ছিল ইহুদীরা। শত শত বছরের অপ্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে তারা আল্লাহর শরীয়াতের গায়ে নিজেদের মনগড়া আইন-বিধানের একটি মোটা চামড়া জড়িয়ে দিয়েছিল। শরীয়াতের মধ্যে তারা অসংখ্য বিধি-নিষেধ, সূক্ষ্মতা ও কঠোরতা বৃদ্ধি করেছিল। বহু হালাল জিনিসকে তারা হারাম করে নিয়েছিল। অনেক কল্পনাভিত্তিক কুসংস্কারকে তারা আল্লাহর আইনের অন্তরভুক্ত করে নিয়েছিল। এখন কুরআন যে সহজ সরল শরীয়াত পেশ করছিল তার মর্যাদা অনুধাবন করা তাদের উলামা ও জনগণ উভয়ের মন-মানস ও রুচির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। কুরআনের বিধান শুনে তারা অস্থির হয়ে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۣ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন–সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলো না। লেনদেন হতে হবে পারস্পরিক রেজামন্দির ভিত্তিতে।[৫০] আর নিজেকে হত্যা করো না।[৫১] নিশ্চিত জানো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি মেহেরবান।[৫২]*

পড়তো। এক একটি বিষয়ের ওপর শত শত আপত্তি উথাপন করতো। তাদের দাবী ছিল, যদি কুরআন তাদের ফকীহদের সমস্ত ইজতিহাদ ও তাদের পূর্বপুরুষদের যাবতীয় কাল্পনিক কুসংস্কার ও পৌরানিকতাবাদকে আল্লাহর শরীয়াত হিসেবে গণ্য না করে, তাহলে এটি কখনোই আল্লাহর কিতাব হতে পারে না। যেমন, ইহুদীদের নিয়ম ছিল, মাসিক ঋতুস্রাবের সময় তারা মেয়েদেরকে সম্পূর্ণ নাপাক মনে করতো। তাদের রান্না করা খাবার খেতো না। তাদের হাতের পানি পান করতো না। তাদের সাথে এক বিছানায় বসতো না। এমনকি তাদের হাতের স্পর্শ লেগে যাওয়াকে মকরূহ মনে করা হতো। এই কদিন মেয়েরা তাদের নিজেদের ঘরে নিজেরা 'অচ্ছুৎ' হয়ে থাকতো। ইহুদীদের সংস্পর্শে এসে মদীনার আনসারদের মধ্যেও এই রেওয়াজ চালু হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এলে তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে সূরা বাকারার ২৮ রুকূ'র প্রথম আয়াতটি নাযিল হয়। এই আয়াতের প্রেক্ষিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দেন, মাসিক ঋতুস্রাবের সময় স্ত্রীদের সাথে একমাত্র সংগম করা জায়েয নয়। এ ছাড়া অন্যান্য দিনে স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে যে সমস্ত সম্পর্ক যেভাবে রাখা হতো সেগুলো ঠিক তেমনিভাবেই এখন তাদের সাথে রাখো। এতে ইহুদীরা হৈ চৈ করতে লাগলো। তারা বলতে থাকলো, এ ব্যক্তি তো কসম খেয়ে বসেছে, আমাদের এখানে যা কিছু হারাম হয়ে আছে সেগুলোকে সে হালাল করেই ছাড়বে এবং যেসব জিনিসকে আমরা নাপাক গণ্য করে এসেছি সেগুলোকে পাক–পবিত্র গণ্য করবেই।

৫০. "অন্যায়ভাবে" বলতে এখানে এমন সব পদ্ধতির কথা বুঝানো হয়েছে যা সত্য ও ন্যায়নীতি বিরোধী এবং নৈতিক দিক দিয়েও শরীয়াতের দৃষ্টিতে নাজায়েয। "লেনদেন" মানে হচ্ছে, পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ ও মুনাফার বিনিময় করা। যেমন ব্যবসায়, শিল্প ও কারিগরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সেখানে একজন অন্যজনের প্রয়োজন সরবরাহ করার জন্য পরিশ্রম করে এবং তার বিনিময় দান করে। পারস্পরিক রেজামন্দি অর্থ হচ্ছে, কোন বৈধ চাপ বা ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে লেনদেন হবে না। ঘুষ ও সুদের মধ্যে আপাত রেজামন্দি থাকে কিন্তু আসলে এই রেজামন্দির পেছনে থাকে অক্ষমতা। প্রতিপক্ষ নিজের অক্ষমতার কারণে বাধ্য ও অনন্যোপায় হয়ে চাপের মুখে ঘুষ ও সুদ দিতে রাজী হয়। জুয়ার মধ্যেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে রেজামন্দিই মনে হয়। কিন্তু আসলে জুয়াতে অংশগ্রহণকারী

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝٣٠ اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ۝٣١

*যে ব্যক্তি জুলুম ও অন্যায় বাড়াবাড়ি করে এমনটি করবে তাকে আমি অবশ্যি আগুনে নিক্ষেপ করবো। আর আল্লাহর জন্য এটা কোন কঠিন কাজ নয়। তোমরা যদি বড় বড় গোনাহ থেকে দূরে থাকো, যা থেকে দূরে থাকার জন্য তোমাদের বলা হচ্ছে, তাহলে তোমাদের ছোট-খাটো খারাপ কাজগুলো আমি তোমাদের হিসেব থেকে বাদ দিয়ে দেবো[৫৩] এবং তোমাদের সম্মান ও মর্যাদার জায়গায় প্রবেশ করিয়ে দেবো।*

প্রত্যেক ব্যক্তিই একমাত্র সে-ই বিজয়ী হবে এই ভ্রান্ত আশায় এতে অংশগ্রহণে রাজি হয়। পরাজয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ এতে অংশগ্রহণ করে না। প্রতারণা ও জালিয়াতির কারবারেও বাহ্যত রেজামন্দিই দেখা যায়। কিন্তু এখানে রেজামন্দির পেছনে এই ভুল ধারণা কাজ করে যে, এর মধ্যে প্রতারণা ও জালিয়াতী নেই। দ্বিতীয় পক্ষ যদি জানতে পারে যে, প্রথম পক্ষ তার সাথে প্রতারণা ও জালিয়াতী করছে তাহলে সে কখনোই এতে রাজি হবে না।

৫১. এ বাক্যটি আগের বাক্যের পরিশিষ্ট হতে পারে আবার একটি স্বতন্ত্র বাক্যও হতে পারে। একে যদি আগের বাক্যের পরিশিষ্ট মনে করা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, অন্যের অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাত করা আসলে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করার নামান্তর। এর ফলে সমাজ ব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দেয়। এর অনিষ্টকর পরিণতি থেকে হারামখোর ব্যক্তি নিজেও রক্ষা পেতে পারে না এবং আখেরাতে এর কারণে মানুষ কঠিন শাস্তির অধিকারী হয়। আর যদি একে একটি স্বতন্ত্র বাক্য মনে করা হয় তাহলে এর দু'টি অর্থ হয়। এক, পরস্পরকে হত্যা করো না। দুই, আত্মহত্যা করো না। মহান আল্লাহ এ ক্ষেত্রে এমন ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং বাক্য এমনভাবে গঠন করেছেন যার ফলে এই তিনটি অর্থই এখান থেকে পাওয়া যেতে পারে এবং তিনটি অর্থই সত্য।

৫২. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের শুভাকাংখী। তিনি তোমাদের ভালো চান। তিনি তোমাদের এমন কাজ করতে নিষেধ করছেন যার মধ্যে তোমাদের নিজেদের ধ্বংস নিহিত রয়েছে। এটা তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৫৩. অর্থাৎ আমি সংকীর্ণমনা নই এবং সংকীর্ণ দৃষ্টির অধিকারীও নই। ছোটখাটো ভুল-ভ্রান্তি ধরে আমি বান্দাকে শাস্তি দেই না। তোমাদের আমলনামায় যদি বড় বড় অপরাধ না থাকে তাহলে ছোটখাটো অপরাধগুলোকে উপেক্ষা করা হবে এবং তোমাদের

বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনাই হবে না। তবে যদি তোমরা বড় বড় অপরাধ করে থাকো, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে মামলা চালানো হবে এবং তাতে ছোটখাটো অপরাধগুলোও ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হবে, সেজন্য পাকড়াও করা হবে।

এখানে বড় গোনাহ ও ছোট গোনাহর মধ্যে নীতিগত পার্থক্য বুঝে নেয়া উচিত। কুরআন ও সুন্নাতের মধ্যে আমি যতটুকু চিন্তা–ভাবনা করতে পেরেছি তাতে আমি এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছি (তবে যথার্থ সত্য একমাত্র আল্লাহ জানেন) যে, তিনটি কারণে কোন কাজ বড় গোনাহে পরিণত হয় ঃ

এক ঃ কারো অধিকার হরণ করা। সে অধিকার আল্লাহর, বাপ–মার, অন্য মানুষের বা হরণকারীর নিজেরও হতে পারে। তারপর যার অধিকার যত বেশী হবে তার অধিকার হরণও ঠিক তত বেশী বড় গোনাহ হবে। এ কারণেই গোনাহকে 'জুলুম'ও বলা হয়। আর এ জন্য কুরআনে শিরককে জুলুম বলা হয়েছে।

দুই ঃ আল্লাহকে ভয় না করা এবং আল্লাহর মোকাবিলায় আত্মম্ভরিতা করা, এর ফলে মানুষ আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পরোয়া করে না। তাঁর নাফরমানি করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করেই এমন কাজ করে যা করতে তিনি নিষেধ করেছেন এবং জেনে বুঝে এমন কাজ থেকে বিরত থাকে যা করার জন্য তিনি হুকুম দিয়েছেন। এই নাফরমানি যে পরিমাণ নির্লজ্জতা, অহমিকা, দুঃসাহস ও আল্লাহভীতির মনোভাবে সমৃদ্ধ হবে গোনাহটিও ঠিক সেই পর্যায়ের কঠিন ও মারাত্মক হবে। এই অর্থের প্রেক্ষিতেই গোনাহের জন্য 'ফিসৃক' (ফাসেকী) ও 'মাসিয়াত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

তিন ঃ যে সমস্ত সম্পর্কের সুস্থতা ও বলিষ্ঠতার ওপর মানব জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে সেগুলো বিকৃত ও ছিন্ন করা। এ সম্পর্ক বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে এবং বান্দা ও বান্দার মধ্যে হতে পারে। আবার যে সম্পর্ক যত বেশী গুরুত্বপূর্ণ, যা ছিন্ন করলে শান্তি ও নিরাপত্তার যত বেশী ক্ষতি হয় এবং যার ব্যাপারে যত বেশী নিরাপত্তার আশা করা যেতে পারে, তাকে ছিন্ন করা, কেটে ফেলা ও নষ্ট করার গোনাহ তত বেশী বড় হয়। যেমন যিনা ও তার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে চিন্তা করুন। এ কাজটি আসলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই এটি মূলত একটি বড় গোনাহ। কিন্তু এর বিভিন্ন অবস্থা গোনাহের ব্যাপারে একটি অন্যটির চাইতে বেশী মারাত্মক। বিবাহিত ব্যক্তির যিনা করা অবিবাহিত ব্যক্তির যিনা করার তুলনায় অনেক কঠিন গোনাহ। বিবাহিত মহিলার সাথে যিনা করা অবিবাহিতা মেয়ের সাথে যিনা করার তুলনায় অনেক বেশী দুষণীয়। প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা অপ্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করার তুলনায় বেশী খারাপ। মাহরাম মহিলা যেমন মা, মেয়ে, বোনের সাথে যিনা করা অন্য অনাত্মীয় মহিলার সাথে যিনা করার তুলনায় অনেক বেশী পাপ। অন্য কোন জায়গায় যিনা করার তুলনায় মসজিদে যিনা করা কঠিন গোনাহ। ওপরে বর্ণিত কারণের ভিত্তিতে এই দৃষ্টান্তগুলোতে একই কাজের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে গোনাহ হবার দিক দিয়ে পর্যায়ের পার্থক্য সূচিত হয়েছে। যেখানে নিরাপত্তার আশা যত বেশী, যেখানে মানবিক সম্পর্ক যত বেশী সম্মানের অধিকারী এবং যেখানে এই সম্পর্ক ছিন্ন করা যত বেশী বিপর্যয়ের কারণ বলে বিবেচতি হয়, সেখানে যিনা করা তত বেশী বড় গোনাহ। এই অর্থের প্রেক্ষিতে গোনাহের জন্য 'ফুজুর' এর পরিভাষা ব্যবহার করা হয়।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۚ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٢﴾ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٣٣﴾

*আর যা কিছু আল্লাহ তোমাদের কাউকে অন্যদের মোকাবিলায় বেশী দিয়েছেন তার আকাংখা করো না। যা কিছু পুরুষরা উপার্জন করেছে তাদের অংশ হবে সেই অনুযায়ী। আর যা কিছু মেয়েরা উপার্জন করেছে তাদের অংশ সেই অনুযায়ী। হাঁ, আল্লাহর কাছে তাঁর ফযল ও মেহেরবানীর জন্য দোয়া করতে থাকো। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত জিনিসের জ্ঞান রাখেন।*[৫৪]

*আর বাপ-মা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তিতে আমি তাদের হকদার নির্ধারিত করে দিয়েছি। এখন থাকে তারা, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ও অংগীকার আছে, তাদের অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও। নিশ্চিত জেনে রাখো আল্লাহ সব জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণকারী।*[৫৫]

৫৪. এই আয়াতে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক বিধান দেয়া হয়েছে। এটি সংরক্ষিত এবং যথাযথভাবে কার্যকরী করা হলে সমাজ জীবনে মানুষ বিপুল শান্তি ও নিরাপত্তা লাভে সক্ষম হবে। আল্লাহ সমস্ত মানুষকে সমান করে তৈরী করেননি। বরং তাদের মধ্যে অসংখ্য দিক দিয়ে পার্থক্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। কেউ সুশ্রী, কেউ কুশ্রী। কেউ সুকন্ঠ, কেউ কর্কশ ভাষী। কেউ শক্তিশালী, কেউ দুর্বল। কেউ পূর্ণাংগ সুগঠিত অংগ-প্রত্যংগের অধিকারী, আবার কেউ জন্মগতভাবে পংগু। কাউকে শারীরিক ও মানসিক শক্তির মধ্যে কোন একটি শক্তি বেশী দেয়া হয়েছে আবার কাউকে দেয়া হয়েছে অন্য কোন শক্তি। কাউকে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় পয়দা করা হয়েছে আর কাউকে খারাপ অবস্থায়। কাউকে বেশী উপায় উপকরণ দেয়া হয়েছে, কাউকে দেয়া হয়েছে কম। এ তারতম্য ও পার্থক্যের ভিত্তিতেই মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি বৈচিত্রমণ্ডিত হয়েছে। আর এটিই বুদ্ধি ও যুক্তিসমত। কিন্তু যেখানেই এই পার্থক্যের স্বাভাবিক সীমানা ছাড়িয়ে মানুষ তার ওপর নিজের কৃত্রিম পার্থক্যের বোঝা চাপিয়ে দেয় সেখানেই এক ধরনের বিপর্যয় দেখা দেয়। আর যেখানে আদতে এই পার্থক্যকেই বিলুপ্ত করে দেবার জন্য প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালানো হয় সেখানে আর এক ধরনের বিপর্যয় দেখা দেয়। মানুষের মধ্যে একটি বিশেষ মানসিকতা দেখা যায়। নিজের চাইতে কাউকে অগ্রসর দেখতে পেলে সে অস্থির

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۭ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۭ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ۝ وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۝

৬ রুকূ'

*পুরুষ নারীর কর্তা।[৫৬] এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের একজনকে অন্য জনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন[৫৭] এবং এ জন্য যে, পুরুষ নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। কাজেই সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা আনুগত্যপরায়ণ হয় এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর হেফাজত ও তত্বাবধানে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে।[৫৮] আর যেসব স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা করো, তাদেরকে বুঝাও, শয়নগৃহে তাদের থেকে আলাদা থাকো এবং তাদেরকে মারধোর করো।[৫৯] তারপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে অযথা তাদের ওপর নির্যাতন চালাবার জন্য বাহানা তালাশ করো না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ ওপরে আছেন, তিনি বড় ও শ্রেষ্ঠ। আর যদি কোথাও তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিগড়ে যাবার আশংকা দেখা দেয় তাহলে পুরুষের আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন সালিশ এবং স্ত্রীর আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন সালিশ নির্ধারিত করে দাও। তারা দু'জন[৬০] সংশোধন করে নিতে চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসা ও মিলমিশের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ।[৬১]*

হয়ে পড়ে। মানুষের এই মানসিকতা তাই সমাজ জীবনে হিংসা, বিদ্বেষ, রেষারেষি, শত্রুতা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত ইত্যাদি সৃষ্টির মূল। এরই ফলে যে অনুগ্রহ সে বৈধ পথে অর্জন করতে পারে না তাকে অবৈধ পথে লাভ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। এই মানসিকতা থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে নির্দেশ দিচ্ছেন, তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে,

অন্যদের প্রতি তিনি যে অনুগ্রহ করেছেন তুমি তার আকাংখা করো না। তবে আল্লাহর কাছে অনুগ্রহের জন্য দোয়া করো। তিনি নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী তোমার জন্য যে অনুগ্রহটি উপযোগী মনে করবেন সেটিই তোমাকে দান করবেন। আর তিনি যে বলেছেন, "যা কিছু পুরুষরা উপার্জন করেছে তাদের অংশ হবে সেই অনুযায়ী আর যা কিছু মেয়েরা উপার্জন করেছে তাদের অংশ হবে সেই অনুযায়ী" এর অর্থ যতদূর আমি বুঝতে পেরেছি তা হচ্ছে এই যে, পুরুষদের ও মেয়েদের মধ্য থেকে যাকে আল্লাহ যাই কিছু দিয়েছেন তাকে ব্যবহার করে যে যেমন কিছু নেকী বা গোনাহ অর্জন করবে সেই অনুযায়ী অথবা অন্য কথায় সেই জাতীয় জিনিসের মধ্য থেকেই আল্লাহর কাছে সে অংশ পাবে।

৫৫. আরববাসীদের নিয়ম ছিল, যাদের মধ্যে বন্ধুত্ব বা ভ্রাতৃত্বের চুক্তি ও অংগীকার হয়ে যেতো, তারা পরস্পরের উত্তরাধিকারী হয়ে যেতো। এভাবে যাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করা হতো, সেও পালক পিতার সম্পত্তির ওয়ারিস হয়ে যেতো। এই আয়াতে জাহেলিয়াতের এই পদ্ধতিটি বাতিল করে বলা হয়েছে, মীরাস তো আমার নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে, তবে যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ও অংগীকার আছে তাদেরকে তোমরা নিজেদের জীবদ্দশায় যা চাও দিতে পারো।

৫৬. কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে, 'কাওয়াম'। এমন এক ব্যক্তিকে 'কাওয়াম' বা 'কাইয়েম' বলা হয়, যে কোন ব্যক্তির, প্রতিষ্ঠানের বা ব্যবস্থাপনার যাবতীয় বিষয় সঠিকভাবে পরিচালনা, তার হেফাজত ও তত্বাবধান এবং তার প্রয়োজন সরবরাহ করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল হয়।

৫৭. এখানে সম্মান ও মর্যাদা অর্থে শ্রেষ্ঠত্ব শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি যেমন সাধারণত আমাদের ভাষায় হয়ে থাকে এবং এক ব্যক্তি এ শব্দটি বলার সাথে সাথেই এর এই অর্থ গ্রহণ করে। বরং এখানে এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাদের এক পক্ষকে (অর্থাৎ পুরুষ) প্রকৃতিগতভাবে এমন সব বৈশিষ্ট ও গুণাবলী দান করেছেন যা অন্য পক্ষটিকে (অর্থাৎ নারী) দেননি অথবা দিলেও প্রথম পক্ষের চেয়ে কম দিয়েছেন। এ জন্য পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় পুরুষই 'কাওয়াম' বা কর্তা হবার যোগ্যতা রাখে। আর নারীকে প্রাকৃতিক দিক দিয়ে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, পারিবারিক জীবন ক্ষেত্রে তাকে পুরুষের হেফাযত ও তত্বাবধানে থাকা উচিত।

৫৮. হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সেই স্ত্রীই সর্বোত্তম, যাকে দেখলে তোমার মন আনন্দে ভরে যায়। তুমি তাকে কোন আদেশ করলে সে তোমার আনুগত্য করে। আর তুমি ঘরে না থাকলে সে তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার ধন-সম্পদের ও তার নিজের হেফাজত করে।" এ হাদীসটি এই আয়াতের চম-ৎকার ব্যাখ্যা পেশ করে। কিন্তু এখানে ভালোভাবে একথা বুঝে নিতে হবে যে, স্ত্রীর জন্য নিজের স্বামীর আনুগত্যের চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগণ্য হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য। কাজেই কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে আল্লাহর নাফরমানি করার হুকুম দেয় অথবা আল্লাহর অর্পিত কোন ফরয থেকে তাকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করতে অস্বীকার করা স্ত্রীর জন্য ফরয হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় যদি স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করে তাহলে সে গোনাহগার হবে। বিপরীত পক্ষে স্বামী যদি স্ত্রীকে নফল নামায পড়তে বা নফল রোযা রাখতে নিষেধ করে তাহলে স্বামীর কথা মেনে চলা তার

জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় নফল ইবাদাত করলে তা আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না।

৫৯. তিনটি কাজ একই সংগে করার কথা এখানে বলা হয়নি। বরং এখানে বক্তব্য হচ্ছে, অবাধ্যতা দেখা দিলে এই তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বন করার অনুমতি রয়েছে। এখন এগুলোর বাস্তবায়নের প্রশ্ন। এ ক্ষেত্রে অবশ্যি দোষ ও শাস্তির মধ্যে আনুপাতিক সম্পর্ক থাকতে হবে। যেখানে হালকা ব্যবস্থায় কাজ হয়ে যায়, সেখানে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করা উচিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম যেখানেই স্ত্রীদের মারার অনুমতি দিয়েছেন। সেখানেই তা দিয়েছেন একান্ত অনিচ্ছা সহকারে এবং লাচার হয়েই। আবার তারপরও একে অপছন্দ করেছেন। তবুও কোন কোন স্ত্রী এমন হয়ে থাকে যাদেরকে মারধর না করলে সোজা থাকে না। এ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ হচ্ছে, তাদের মুখে বা চেহারায় মেরো না, নির্দয়ভাবে মেরো না এবং এমন জিনিস দিয়ে মেরো না, যা শরীরে দাগ রেখে যায়।

৬০. দু'জন বলতে এখানে দু'জন সালিশকে বুঝানো হয়েছে। আবার স্বামী–স্ত্রীকেও বুঝানো হয়েছে। যে কোন ঝগড়া বিবাদের অবিশ্য মীমাংসা হতে পারে। তবে বিবদমান পক্ষ দু'টি মীমাংসা চায় কিনা এবং যারা মাঝখানে থেকে সালিশ করেন তাঁরা আন্তরিকতার সাথে উভয় পক্ষের মধ্যে মিলমিশ করে দিতে চান কিনা, এরি ওপর মীমাংসার সবটুকু নির্ভর করে।

৬১. এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি দেখা দিলে বিরোধ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর্যায়ে পৌঁছাবার বা ব্যাপারটি আদালত পর্যন্ত গড়াবার আগেই ঘরেই তার সংশোধন ও মীমাংসার চেষ্টা করা উচিত। এ জন্য এ পদ্ধতি বাতলানো হয়েছে যে, স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের পরিবার থেকে একজন করে লোক নিয়ে দু'জনের একটি সালিশ কমিটি বানাতে হবে। তারা উভয়ে মিলে বিরোধের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবেন। তারপর এক সাথে বসে এর সামাধান ও মীমাংসার পথ বের করবেন। এই সালিশ কে নিযুক্ত করবে? এ প্রশ্নটি আল্লাহ অস্পষ্ট রেখেছেন। এর কারণ হচ্ছে, স্বামী–স্ত্রী চাইলে নিজেদের আত্মীয়দের মধ্য থেকে নিজেরাই একজন করে লোক বাছাই করে আনতে পারে। তারাই তাদের বিরোধ নিস্পত্তি করবে। আবার উভয়ের পরিবারের বয়স্ক লোকেরা এগিয়ে এসে এ ধরনের সালিশ নিযুক্ত করতে পারে। আর ব্যাপারটি যদি আদালতে চলে যায়, তাহলে আদালত নিজেই কোন সিদ্ধান্ত দেবার আগে পারিবারিক সালিশ নিযুক্ত করে এর মীমাংসা করে দিতে পারে।

সালিশদের ক্ষমতার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ফকীহদের একটি দল বলেন, এই সালিশে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও মীমাংসা চাপিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই। তবে তাদের মতে, ঝগড়া মিটমাট করার যে সংগত ও সম্ভাব্য পদ্ধতি হতে পারে সেজন্য তারা সুপারিশ করতে পারে। এই সুপারিশ মেনে নেয়া না নেয়ার ইখতিয়ার স্বামী–স্ত্রীর আছে। তবে স্বামী–স্ত্রী যদি তাদেরকে তালাক বা খুলা তালাক অথবা অন্য কোন ব্যাপারে মীমাংসা করে দেবার জন্য দায়িত্বশীল হিসেবে নিযুক্ত করে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে অবশ্যি তাদের ফায়সালা মেনে নেয়া স্বামী–স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব হয়ে পড়বে। হানাফী ও শাফেয়ী আলেমগণ এই মত পোষণ করেন। অন্য দলের মতে, উভয় সালিশের ইতিবাচক

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ ﴿٣٦﴾ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۚ ﴿٣٧﴾

*আর তোমরা সবাই আল্লাহর বন্দেগী করো। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। বাপ–মা'র সাথে ভালো ব্যবহার করো। নিকট আত্মীয় ও এতিম–মিসকিনদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্বসাথী,[৬২] মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন বাদী ও গোলামদের প্রতি সদয় ব্যবহার করো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ এমন কোন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না যে আত্মঅহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে এবং নিজের বড়াই করে। আর আল্লাহ এমন লোকদেরকেও পছন্দ করেন না, যারা কৃপণতা করে, অন্যদেরকেও কৃপণতা করার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন সেগুলো গোপন করে।[৬৩] এই ধরনের অনুগ্রহ অস্বীকারকারী লোকদের জন্য আমি লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।*

সিদ্ধান্ত দেবার এবং ঝগড়া মিটমাট করে আবার একসাথে মিলেমিশে চলার ফায়সালা করার ইখতিয়ার আছে কিন্তু স্বামী–স্ত্রীকে আলাদা করে দেবার অধিকার তাদের নেই। হাসান বসরী, কাতাদাহ এবং অন্যান্য বেশ কিছু সংখ্যক ফকীহ এই মত পোষণ করেন। তৃতীয় একটি দলের মতে, এই সালিশদ্বয় স্বামী–স্ত্রীকে মিলিয়ে দেবার বা আলাদা করার পূর্ণ ইখতিয়ার রাখে। ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইবরাহীম নাখঈ, সা'বী, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন এবং অন্যান্য ফকীহগণ এই মতের প্রবক্তা।

হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলীর (রা) ফায়সালার যেসব নজীর আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তা থেকে জানা যায়, তারা উভয়েই সালিশ নিযুক্ত করার সাথে সাথেই আদালতের পক্ষ থেকে তাদেরকে নিজেদের ফায়সালা কার্যকর করার প্রশাসনিক ক্ষমতা দান করতেন। তাই হযরত আকীল ইবনে আবু তালেব এবং তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতেমা বিনতে উতবাহ ইবনে রাবীআর মামলা যখন হযরত উসমানের আদালতে দায়ের করা

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاۤءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَاۤءَ قَرِيْنًا ﴿٣٨﴾

*আর আল্লাহ তাদেরকেও অপছন্দ করেন, যারা নিজেদের ধন–সম্পদ কেবল মাত্র লোকদেরকে দেখাবার জন্য ব্যয় করে এবং আসলে না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে আর না আখেরাতের দিনের প্রতি। সত্য বলতে কি, শয়তান যার সাথী হয়েছে তার ভাগ্যে বড় খারাপ সাথীই জুটেছে।*

হলো তখন তিনি স্বামীর পরিবার থেকে হযরত ইবনে আব্বাসকে এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে হযরত মুআবীয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকে সালিশ নিযুক্ত করলেন এবং তাদেরকে বললেন, আপনারা দু'জন যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তাদের স্বামী–স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে তাহলে তা করে দেবেন। অনুরূপভাবে একটি মামলায় হযরত আলী সালিশ নিযুক্ত করেন। তাদেরকে মিলিয়ে দেবার বা আলাদা করে দেবার ইখতিয়ার দান করেন। এ থেকে জানা যায়, সালিশের নিজস্ব কোন আদালতী ক্ষমতা বা ইখতিয়ার নেই। তবে তাদের নিযুক্তির সময় আদালত যদি তাদেরকে ক্ষমতা দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের ফায়সালা আদালতের ফায়সালার ন্যায় প্রবর্তিত হবে।

৬২. মূল ইবারতে বলা হয়েছে ঃ "আস্‌সা–হিবু বিল জানবে।" এর অর্থ অন্তরংগ বন্ধু–বান্ধব হতে পারে আবার এমন লোকও হতে পারে যে জীবন পথে চলার ক্ষেত্রে কোন এক পর্যায়ে সংগ দিয়ে থাকে। যেমন, আপনি বাজারে যাচ্ছেন এবং পথে কোন ব্যক্তি আপনার সাথে চলছে। অথবা কোন দোকানে আপনি সওদা কিনছেন এবং অন্য কোন খরিদ্দারও আপনার পাশে বসে রয়েছে। অথবা সফরের মাঝপথে কোন ব্যক্তি আপনার সফর সংগী হয়ে গেলেন। এই সাময়িক সংগও প্রত্যেক ভদ্র ও শালীন ব্যক্তির ওপর বেশ কিছু অধিকার ও দায়িত্ব অর্পণ করে। যার ফলে সে যথাসম্ভব তার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং তাকে কষ্ট দিতে বিরত থাকে।

৬৩. মানুষ যদি এমনভাবে থাকে যাতে মনে হয় আল্লাহ তার ওপর কোন অনুগ্রহ করেননি, তাহলে এটাই হয় আল্লাহর অনুগ্রহকে গোপন করা। যেমন কাউকে আল্লাহ অর্থ–সম্পদ দান করেছেন কিন্তু সে নিজের সামর্থের তুলনায় অনেক নিম্নমানের জীবন যাপন করে। নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করে না। মানুষকে আর্থিক সাহায্য করে না। সৎকাজে অর্থ–সম্পদ ব্যয় করে অংশ গ্রহণ করে না। বাইরের কোন লোক তাকে দেখে মনে করে, এ বেচারা বড়ই গরীব। এটা আসলে আল্লাহর প্রতি মারাত্মক পর্যায়ের অকৃতজ্ঞতা। হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَنْعَمَ نِعْمَةً عَلٰى عَبْدٍ اَحَبَّ اَنْ يَّظْهَرَ اَثَرُهَا عَلَيْهِ

"আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে নেয়ামত দান করেন তখন তিনি সেই নেয়ামতের চিহ্ন বান্দার ওপর প্রকাশিত হওয়া পছন্দ করেন।"

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۢ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَاۗءِ شَهِيْدًا ۝ يَوْمَىِٕذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ۭ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ۝

*হ্যাঁ, যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনতো এবং যা কিছু আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করতো, তাহলে তাদের মাথায় এমন কী আকাশ ভেঙে পড়তো? যদি তারা এমনটি করতো, তাহলে তাদের নেকীর অবস্থা আল্লাহর কাছে গোপন থেকে যেতো না। আল্লাহ কারো ওপর এক অণু পরিমাণও জুলুম করেন না। যদি কেউ একটি সৎকাজ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করেন। তারপর চিন্তা করো, তখন তারা কি করবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মাত থেকে একজন সাক্ষী আনবো এবং তাদের ওপর তোমাকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাবো[৬৪] সে সময় যারা রসূলের কথা মানেনি এবং তাঁর নাফরমানি করতে থেকেছে তারা কামনা করবে, হায়! যমীন যদি ফেটে যেতো এবং তারা তার মধ্যে চলে যেতো। সেখানে তারা আল্লাহর কাছ থেকে নিজেদের কোন কথা লুকিয়ে রাখতে পারবে না।*

অর্থাৎ তার খাওয়া-দাওয়া, বসবাস করা, লেবাস-পোশাক, গৃহ, আসবাবপত্র, দান-খয়রাত ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের প্রকাশ হতে হবে।

৬৪. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের নবী তাঁর যুগের লোকদের ব্যাপারে আল্লাহর আদালতে সাক্ষী দিবেন। তিনি এই মর্মে সাক্ষী দেবনে, হে আল্লাহ! জীবনের সোজা-সরলপথ এবং চিন্তা ও কর্মের সঠিক ও নির্ভুল পদ্ধতির যে শিক্ষা তুমি আমাকে দিয়েছিলে তা আমি এদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর এই সাক্ষ্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর যুগের লোকদের ব্যাপারেও পেশ করবেন। আর কুরআন থেকে জানা যায়, তাঁর আগমন কাল থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র সময়-কালই তাঁর যুগ। (আলে ইমরানের ৬৯ টীকা দেখুন)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ
وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

৭ রুকূ'

*হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছে যেয়ো না।[৬৫] নামায সেই সময় পড়া উচিত যখন তোমরা যা বলছো তা জানতে পারো।[৬৬] অনুরূপভাবে অপবিত্র অবস্থায়ও[৬৭] গোসল না করা পর্যন্ত নামাযের কাছে যেয়ো না। তবে যদি পথ অতিক্রমকারী হও,[৬৮] তাহলে অবশ্যি স্বতন্ত্র কথা। আর যদি কখনো তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো, সফরে থাকো বা তোমাদের কেউ মলমূত্র ত্যাগ করে আসে অথবা তোমরা নারী সম্ভোগ করে থাকো[৬৯] এবং এরপর পানি না পাও, তাহলে পাক–পবিত্র মাটির সাহায্য গ্রহণ করো এবং তা নিজেদের চেহারা ও হাতের ওপর বুলাও।[৭০] নিসন্দেহে আল্লাহ কোমলতা অবলম্বনকারী ও ক্ষমাশীল।*

৬৫. এটি মদ সম্পর্কে দ্বিতীয় নির্দেশ। প্রথম নির্দেশটি সূরা বাকারার ২১৯ আয়াতে দেয়া হয়েছে। সেখানে কেবল একথা বলেই শেষ করা হয়েছিল যে, মদ খারাপ জিনিস। আল্লাহ এটি পছন্দ করেন না। একথা বলার পর মুসলমানদের একটি দল মদ পরিহার করেছিল। কিন্তু তখনো অনেক লোক আগের মতোই মদ পান করে চলছিল। এমনকি অনেক সময় নেশায় মাতাল অবস্থায় তারা নামাযে শামিল হয়ে যেতো এবং নামাযে যা পড়ার তা ছাড়া অন্য কিছু পড়ে ফেলতো। সম্ভবত চতুর্থ হিজরীর গোড়ার দিকে এই দ্বিতীয় নির্দেশটি নাযিল হয়। এখানে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। লোকদের ওপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। তারা নিজেদের মদপানের সময় বদলে ফেলে। যখন নেশা থাকা অবস্থায় নামাযের সময় হয়ে যাবার আশংকা থাকতো তখন তারা মদপান থেকে বিরত থাকতো। এর কিছুকাল পরে মদপানের বিরুদ্ধে চরম নিষেধাজ্ঞা আসে। মদপান হারাম হবার এ নির্দেশটি এসেছে সূরা মায়েদার ৯০–৯১ আয়াতে। এখানে একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে 'সুকর' অর্থাৎ 'নেশা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এ নির্দেশটি কেবল মদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না বরং প্রত্যেকটি নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুর সাথেই এর সম্পর্ক। এ নির্দেশটি আজো পুরোপুরি কার্যকর। একদিকে নেশাকর বস্তু

ব্যবহার করা হারাম এবং অন্যদিকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া দ্বিগুণ এবং আরো অনেক বড় গোনাহ।

৬৬. এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, যখন ব্যক্তির ওপর ঘুমের আক্রমণ হয় এবং নামায পড়তে গিয়ে সে বারবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখন তার নামায রেখে ঘুমিয়ে পড়া দরকার। কোন কোন লোক এই আয়াত থেকে এই মর্মে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, যে ব্যক্তি নামাযে পঠিত আরবী ইবারতের অর্থ বোঝে না তার নামায হবে না। কিন্তু এটা আসলে একটা অযথা কাঠিন্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআনের শব্দাবলীও এর সমর্থন করে না। কুরআনে 'হাত্তা তাফ্কাহু' বা 'হাত্তা তাফহামু মা তাকূলূন' (অর্থাৎ যতক্ষণ তোমরা যা বলো তা তোমরা হৃদয়ংগম না করো অথবা বুঝতে না পারো) বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, 'হাত্তা তা'লামূ মা তাকূলূন।' অর্থাৎ নামাযে এক ব্যক্তিকে এতটুকুন সজাগ থাকতে হবে যে, সে নিজের মুখে কি কথা বলছে, তা তাকে অবশ্যি জানতে হবে। সে নামায পড়তে দাঁড়িয়ে যেন গজল গাইতে শুরু না করে দেয়।

৬৭. কুরআনে উল্লেখিত মূল শব্দ হচ্ছে, 'জুনুবান'। এর মানে হচ্ছে, দূর হয়ে যাওয়া, দূরত্ব ও সম্পর্কহীনতা। এ থেকে 'আজনবী' (অপরিচিত) শব্দটি বের হয়েছে। শরীয়াতের পরিভাষায় জুনুব বা জানাবাত অর্থ হচ্ছে, যৌন প্রয়োজন পূর্ণ করার এবং স্বপ্নের মধ্যে বীর্যপাত হবার ফলে যে 'নাজাসাত' বা নাপাকী সৃষ্টি হয়। কারণ এর ফলে মানুষ তাহারাত বা পবিত্রতা শূন্য হয়ে পড়ে।

৬৮. ফকীহ ও মুফাস্সিরগণের একটি দল এই আয়াতের অর্থ এভাবে গ্রহণ করেছেন যে, জুনুবী (নাপাক) অবস্থায় মসজিদে না যাওয়া উচিত। তবে কোন কাজে মসজিদের মধ্য দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে যেতে পারে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আনাস ইবনে মালিক, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ ফকীহগণ এই মত অবলম্বন করেছেন। অন্য এক দলের মতে এর অর্থ হচ্ছে সফর। অর্থাৎ যদি কেউ সফরে থাকে এবং এ অবস্থায় সে জুনুবী হয়ে পড়ে তাহলে তায়াম্মুম করতে পারে। আর মসজিদের ব্যাপারে তাদের মত হচ্ছে এই যে, জুনুবীর জন্য অযু করে মসজিদে বসে থাকা জায়েয। এই মত অবলম্বন করেছেন হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে জুবাইর এবং অন্যান্য কতিপয় ফকীহ। যদিও এ ব্যাপারে প্রায় সবাই একমত যে, কোন ব্যক্তি যদি সফর অবস্থায় জুনুবী হয়ে পড়ে এবং তার পক্ষে গোসল করা সম্ভবপর না হয়, তাহলে সে তায়াম্মুম করে নামায পড়তে পারে। কিন্তু প্রথম দলটি এ বিষয়টি গ্রহণ করেন হাদীস থেকে আর দ্বিতীয় দলটি এর ভিত্তি রাখেন কুরআনের উপরোল্লিখিত আয়াতের ওপর।

৬৯. এখানে কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে 'লামাস'। 'লামাস' অর্থ স্পর্শ করা। ফকীহগণ এই 'স্পর্শ করা' শব্দটির অর্থ গ্রহণের ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, আবু মূসা আশআরী, উবাই ইবনে কা'ব, সাঈদ ইবনে জুবাইর, হাসান বসরী এবং বিভিন্ন ইমামদের মতে এর অর্থ হচ্ছে সহবাস। ইমাম আবু হানীফা, তাঁর শাগরিদবৃন্দ ও ইমাম সুফিয়ান সওরীও এই মতটি অবলম্বন করেছেন। এর বিপরীত মত গ্রহণ করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর। এ ছাড়াও কোন কোন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, হযরত উমর ইবনে খাত্তাবেরও এই অভিমত ছিল। অর্থাৎ তিনি এর অর্থ কেবল মাত্র 'স্পর্শ করা' বা 'হাত লাগানো' নিয়েছেন। ইমাম শাফেঈও এ মতটি গ্রহণ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَٰبِ يَشْتَرُونَ الضَّلَٰلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾

*তুমি কি তাদেরকেও দেখেছো, যাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে?[৭১] তারা নিজেরাই গোমরাহীর খরিদ্দার বনে গেছে এবং কামনা করছে যেন তোমরাও পথ ভুল করে বসো। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের ভালো করেই জানেন এবং তোমাদের সাহায্য–সমর্থনের জন্য আল্লাহ–ই যথেষ্ট।*

করেছেন। আবার কোন কোন ইমাম মাঝামাঝি পথও অবলম্বন করেছেন। যেমন ইমাম মালেকের মতে, যদি নারী বা পুরুষ পরস্পরকে স্পর্শ করে যৌন আবেগ সহকারে, তাহলে তাদের অযু ভেঙে যাবে এবং নামাযের জন্য নতুন করে অযু করতে হবে। কিন্তু যৌন আবেগের তাড়না ছাড়াই যদি তাদের দেহ পরস্পরকে স্পর্শ করে তাহলে এতে কোন ক্ষতি নেই।

৭০. এই নির্দেশটির বিস্তারিত অবস্থা হচ্ছে এই যে, যদি কোন ব্যক্তি অযুবিহীন অবস্থায় থাকে অথবা তার গোসলের প্রয়োজন হয় এবং পানি না পাওয়া যায়, তাহলে সে তায়াম্মুম করে নামায পড়তে পারে। যদি সে অসুস্থ হয় এবং গোসল বা অযু করলে তার জন্য ক্ষতির আশংকা থাকে, তাহলে পানি থাকা সত্ত্বেও সে তায়াম্মুমের অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

তায়াম্মুম অর্থ হচ্ছে, ইচ্ছা বা সংকল্প করা। অর্থাৎ যদি পানি না পাওয়া যায় অথবা পাওয়া গেলেও তার ব্যবহার সম্ভব না হয়, তাহলে পাক–পবিত্র মাটি ব্যবহার করার সংকল্প করা।

তায়াম্মুমের পদ্ধতির ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। একটি দলের মতে এর পদ্ধতি হচ্ছে, একবার মাটির ওপর দুই হাত ঘসে নিয়ে মুখ মণ্ডলের ওপর বুলিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়বার দুই হাত ঘসে নিয়ে তা দুই হাতের কনুই পর্যন্ত বুলিয়ে নিতে হবে। এটিই ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক এবং অধিকাংশ ফকীহের মাযহাব। আর সাহাবা ও তাবেঈদের মধ্য থেকে হযরত আলী, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হাসান বসরী, শা'বী, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ এবং আরো অনেকে এই মত পোষণ করতেন। দ্বিতীয় দলের মতে, মাটিতে কেবলমাত্র একবার হাত ঘসে নেয়াই যথেষ্ট, সেই হাত মুখমণ্ডলের ওপর বুলানো যাবে এবং তারপর কব্জি পর্যন্ত দুই হাতের ওপরও বুলানো যাবে। কনুই পর্যন্ত বুলাবার প্রয়োজন হবে না। এটি আতা, মাকহুল, আওযাঈ ও আহমাদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ ফকীহগণের মাযহাব। সাধারণত আহলে হাদীসগণও এই মতের প্রবক্তা।

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ ۙ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

*যারা ইহুদী হয়ে গেছে,[৭২] তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা শব্দকে তার স্থান থেকে ফিরিয়ে দেয়[৭৩] এবং সত্য দীনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশের জন্য নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে বলে, "আমরা শুনলাম" এবং "আমরা অমান্য করলাম"[৭৪] আর "শোনে না শোনার মতো"[৭৫] এবং বলে "রাঈনা"।[৭৬] অথচ তারা যদি বলতো, "আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম" এবং "শোন" ও "আমাদের প্রতি লক্ষ্য করো" তাহলে এটা তাদেরই জন্য ভালো হতো এবং এটাই হতো অধিকতর সততার পরিচায়ক। কিন্তু তাদের বাতিল পরস্তির কারণে তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়েছে। তাই তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে।*

তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে হাত ঘসা অপরিহার্য নয়। যে জায়গার ওপর ধূলো পড়ে আছে এবং শুকনো মাটি সম্বলিত যেকোনো জায়গায় হাত ঘসে নেয়া এ জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে।

অনেকে প্রশ্ন করেন, এভাবে মাটিতে হাত ঘসে সেই হাত চেহারা ও হাতের ওপর বুলালে তাহারাত তথা পাক-পবিত্রতা অর্জিত হয় কিভাবে? কিন্তু আসলে এটি মানুষের মধ্যে তাহারাতের অনুভূতি এবং নামাযের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্বিক কৌশল বিশেষ। এতে যে লাভটুকু অর্জিত হয় তা হচ্ছে ঃ দীর্ঘদিন পর্যন্ত পানি ব্যবহারে সমর্থ না হলেও মানুষের মধ্যে তাহারাতের অনুভূতি জাগ্রত থাকবে। শরীয়াত পাক-পবিত্রতার যে আইন প্রবর্তন করেছে সে বরাবর তা মেনে চলবে। তার মন থেকে নামায পড়ার যোগ্য হবার অবস্থা ও নামায পড়ার যোগ্য না হবার অবস্থার মধ্যকার পার্থক্যবোধ কখনো বিলুপ্ত হবে না।

৭১. আহ্‌লি কিতাবদের আলেম সমাজ সম্পর্কে কুরআন অনেক ক্ষেত্রে এ বক্তব্য পেশ করেছে যে, "তাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে।" এর কারণ হচ্ছে এই যে, প্রথমত তারা আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ হারিয়ে ফেলেছিল। তারপর আল্লাহর কিতাবের যা কিছু তাদের কাছে ছিল তার প্রাণসত্তা এবং তার উদ্দেশ্য ও মূল বক্তব্য

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا
لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ
أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ
أَنْفُسَهُمْ ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾ انْظُرْ
كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٠﴾

*হে কিতাবধারীগণ! সেই কিতাবটি মেনে নাও যেটি আমি এখন নাযিল করেছি এবং যেটি তোমাদের কাছে আগে থেকে মওজুদ[৭৭] কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে ও তার প্রতি সমর্থন জানায়। আর আমি চেহারা বিকৃত করে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেবার অথবা শনিবার–ওয়ালাদের মতো তাদেরকে অভিশপ্ত করার আগে[৭৮] এর প্রতি ঈমান আনো। আর মনে রাখো, আল্লাহর নির্দেশ প্রতিপালিত হয়েই থাকে। আল্লাহ অবশ্যি শিরককে মাফ করেন না।[৭৯] এ ছাড়া অন্যান্য যত গোনাহই হোক না কেন তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন।[৮০] যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করেছে সেতো এক বিরাট মিথ্যা রচনা করেছে এবং কঠিন গোনাহের কাজ করেছে।*

*তুমি কি তাদেরকেও দেখেছো, যারা নিজেদের আত্মশুদ্ধি ও আত্মপবিত্রতার বড়াই করে বেড়ায়? অথচ শুদ্ধি ও পবিত্রতা আল্লাহ যাকে চান তাকে দেন। আর (তারা যে শুদ্ধি ও পবিত্রতা লাভ করে না সেটা আসলে) তাদের ওপর বিন্দুমাত্রও জুলুম করা হয় না। আচ্ছা, দেখো তো, এরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। এদের স্পষ্ট গোনাহগার হবার ব্যাপারে এই একটি গোনাহই যথেষ্ট।*

বিষয়ও তাদের কাছে অপরিচিত হয়ে উঠেছিল। তাদের সমস্ত আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছিল শাব্দিক বিতর্ক, বিধান ও নির্দেশাবলীর খুঁটিনাটি আলোচনা এবং আকীদা–বিশ্বাসের দার্শনিক জটিলতার মধ্যে। এ কারণেই তারা দীনের তাৎপর্য ও

সারবস্তুর সাথে অপরিচিত ছিল। তাদের মধ্যে যথার্থ দীনদারীর চিহ্নমাত্রও ছিল না। অথচ তাদেরকে ধর্মীয় আলেম ও জাতির নেতা বলা হতো।

৭২. 'যারা ইহুদী' না বলে বলেছেন, 'যারা ইহুদী হয়ে গেছে।' এর কারণ প্রথম তারাও মুসলমানই ছিল, যেমন প্রত্যেক নবীর উম্মাত আসলে মুসলমান হয়। কিন্তু পরে তারা কেবলমাত্র ইহুদী হয়েই রয়ে গেছে।

৭৩. এর তিনটি অর্থ হয়। এক, তারা আল্লাহর কিতাবের শব্দের মধ্যে হেরফের করে দেয়। দুই, তারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যার সাহায্যে কিতাবের আয়াতের অর্থের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আনে। তিন, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের সাহচর্যে এসে তাদের কথা শোনে এবং সেখান থেকে ফিরে গিয়ে লোকদের সামনে তাঁদের সম্পর্কে বানোয়াট কথা বলে। একটি কথা একভাবে বলা হয় এবং তারা নিজেদের শয়তানী মনোবৃত্তি ও দুষ্টবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাকে ভিন্নরূপ দিয়ে লোকদের সামনে এনে হাজির করে। এভাবে তারা নবী ও তাঁর অনুসারীদের দুর্নাম করে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে ইসলামী দাওয়াত থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে।

৭৪. অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহর বিধান শুনানো হলে তারা উচ্চৈস্বরে বলে ওঠে, "সামে'না" (আমরা শুনেছি) এবং নীচু স্বরে বলে, "আসাইনা" (আমরা অমান্য করলাম)। অথবা তারা "আতা'য়না" (আমরা আনুগত্য করলাম) শব্দটি এমনভাবে নিজেদের কণ্ঠ বাঁকিয়ে ওলটপালট করে উচ্চারণ করে যার ফলে তা "আসাইনা" (আমরা অমান্য করলাম) হয়ে যায়।

৭৫. অর্থাৎ কথাবার্তার মাঝখানে যখন তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন কথা বলতে চায় তখন বলে, "ইস্মা" (শুনুন)। আবার সাথে সাথেই বলে ওঠে, "গাইরা মুসমাঈন।" এই "গাইরা মুসমাঈন" শব্দের দুই অর্থ হতে পারে। এর একটি অর্থ হতে পারে ঃ আপনি এমনি একজন সম্মানিত বুযর্গ, যাকে তার ইচ্ছা বিরোধী কোন কথা শুনানো যেতে পারে না। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে ঃ তোমাকে কেউ কিছু শুনাবে এমন যোগ্যতা তোমার নেই। এর আর একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ করুন তুমি যেন বধির হয়ে যাও।

৭৬. এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা বাকারার ১০৮ টীকা দেখুন।

৭৭. এর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আলে ইমরানের ২ টীকা।

৭৮. সূরা বাকারার ৮২ ও ৮৩ টীকা দেখুন।

৭৯. একথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, আহ্লি কিতাবগণ নবী ও আসমানী কিতাবের অনুসৃতির দাবী করলেও তারা শিরকের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল।

৮০. এর অর্থ এ নয় যে, মানুষ কেবলমাত্র শিরক করবে না এবং বাদবাকি গোনাহ এন্তার করে যেতে থাকবে প্রাণ খুলে। বরং এ থেকে একথা বুঝানো হয়েছে যে, শিরকের গোনাহকে তারা মামুলি গোনাহ মনে করে এসেছে। অথচ এটিই সবচেয়ে বড় গোনাহ। এমন কি অন্য সমস্ত গোনাহ মাফ হতে পারে কিন্তু এই গোনাহটি মাফ করা হবে না।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾

৮ রুকূ'

*তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যাদেরকে কিতাবের জ্ঞান থেকে কিছু অংশ দেয়া হয়েছে এবং তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা জিব্‌ত[৮১] ও তাগুতকে[৮২] মানে আর কাফেরদের সম্পর্কে বলে, ঈমানদারদের তুলনায় এরাই তো অধিকতর নির্ভুল পথে চলছে?[৮৩] এই ধরনের লোকদের ওপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন। আর যার ওপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করেন তোমরা তার কোন সাহায্যকারী পাবে না। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের কোন অংশ আছে কি? যদি তাই হতো, তাহলে তারা অন্যদেরকে একটি কানাকড়িও দিতো না।[৮৪]*

ইহুদী আলেমরা শরীয়াতের ছোট ছোট বিধি–নিষেধ পালনের ওপর বড় বেশী গুরুত্ব দিতেন। বরং তাদের সমস্ত সময় এসব ছোটখাটো বিধানের পর্যালোচনা ও যাচাই বাছাইয়ে অতিবাহিত হতো। তাদের ফকীহগণ এই খুঁটিনাটি বিধানগুলো বের করেছিলেন ইজতিহাদের মাধ্যমে। কিন্তু তাদের চোখে শিরক ছিল একটি হালকা ও ছোট গোনাহ। তাই এই গোনাহটির হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা কোন প্রকার চিন্তা ও প্রচেষ্টা চালাননি। নিজেদের জাতিকে মুশরিকী কার্যকলাপ থেকে বাঁচাবার জন্য কোন উদ্যোগও তারা নেননি। মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব এবং তাদের সাহায্য সহযোগিতাও. তাদের কাছে ক্ষতিকর মনে হয়নি।

৮১. 'জিব্‌ত' মানে অসত্য, অমূলক, ভিত্তিহীন ও অকল্যাণকর জিনিস। ইসলামের পরিভাষায় যাদু, টোনা, টোটকা, ভাগ্য গণনা, জ্যোতিষ, তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাকার কুসংস্কার ও অন্যান্য যাবতীয় কাল্পনিক ও বানোয়াট কথা ও ক্রিয়াকর্মকে জিব্‌ত বলা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

النياقة والطرق والطير من الجبت

অর্থাৎ "পশুর ধ্বনি থেকে আন্দাজে ভালো–মন্দ অর্থ গ্রহণ করা, মাটির ওপর পশুর পদচিহ্ন থেকে সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য মূলক ভালো-মন্দ ধারণা নেয়া এবং এই ধরনের কাল্পনিক

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

*তাহলে কি অন্যদের প্রতি তারা এ জন্য হিংসা করছে যে, আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহ দানে সমৃদ্ধ করেছেন।[৮৫] যদি এ কথাই হয়ে থাকে, তাহলে তাদের জেনে রাখা দরকার, আমি ইবরাহীমের সন্তানদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি এবং তাদেরকে দান করেছি বিরাট রাজত্ব।[৮৬] কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কেউ এর ওপর ঈমান এনেছে আবার কেউ এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।[৮৭] আর যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের জন্য তো জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনই যথেষ্ট। যারা আমার আয়াতগুলো মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদেরকে আমি নিশ্চিতভাবেই আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবো। আর যখন তাদের চামড়া পুড়ে গলে যাবে তখন তার জায়গায় আমি অন্য চামড়া তৈরী করে দেবো, যাতে তারা খুব ভালোভাবে আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ বিপুল ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি নিজের ফায়সালাগুলো বাস্তবায়নের কৌশল খুব ভালোভাবেই জানেন।*

আন্দাজ অনুমানভিত্তিক সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য চিহ্নিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি জিবৃত এর অন্তরভুক্ত।" কাজেই আমাদের ভাষায় আমরা যাকে কুসংস্কার বলি এবং ইংরাজীতে যাকে বলা হয় Superstitions সেটিই আসলে জিবৃত।

৮২. এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা বাকারার ২৮৬ ও ২৮৮ টীকা দু'টি দেখুন।

৮৩. ইহুদী আলেমদের হঠধর্মিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে তারা আরবের মুশরিকদের চাইতেও বেশী গোমরাহ মনে করতো। তারা বলতো, এদের চাইতে এই মুশরিকরাই তো বেশী সত্য পথের অনুসারী। অথচ তারা স্পষ্ট দেখছিল, একদিকে রয়েছে নির্ভেজাল তাওহীদ, যার মধ্যে শিরকের সামান্য গন্ধও নেই আর অন্যদিকে নির্ভেজাল মূর্তিপূজা, যার নিন্দায় ও প্রতিবাদে সমগ্র বাইবেল উচ্চ কণ্ঠ।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*আর যারা আমার আয়াতগুলো মেনে নিয়েছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে এমন সব বাগিচার মধ্যে প্রবেশ করাবো যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা থাকবে চিরস্থায়ীভাবে, তারা সেখানে পবিত্র স্ত্রীদেরকে লাভ করবে এবং তাদেরকে আমি আশ্রয় দেবো ঘন স্নিগ্ধ ছায়াতলে।*

*হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারদের হাতে ফেরত দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর লোকদের মধ্যে ফায়সালা করার সময় 'আদল' ও ন্যায়নীতি সহকারে ফায়সালা করো।[৮৮] আল্লাহ তোমাদের বড়ই উৎকৃষ্ট উপদেশ দান করেন। আর অবশ্যি আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।*

৮৪. অর্থাৎ কে সত্য পথে আছে আর কে সত্য পথে নেই, একথা বলার ক্ষমতা তারা কোথায় থেকে পেলো? আল্লাহর রাজত্বের কোন অংশ কি তাদের অধিকারে এসেছে? যদি এমন হতো, তাহলে অন্যেরা তাদের হাত থেকে একটি কানাকড়িও পেতো না। কারণ তাদের মন বড়ই সংকীর্ণ, সত্যের স্বীকৃতিটুকু পর্যন্ত দিতেও তারা অপারগ। এর দ্বিতীয় অর্থ এই হতে পারে : তাদের হাতে কি কোন দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা আছে যে, অন্যেরা তাতে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছে এবং তারা ওদেরকে তা থেকে কিছুই দিতে চায় না? এখানে নিছক অধিকারের স্বীকৃতির প্রশ্ন ওঠে। আর এ ব্যাপারেও তারা কার্পণ্য করছে।

৮৫. অর্থাৎ তারা নিজেদের অযোগ্যতা সত্ত্বেও নিজেরাই আল্লাহর যে অনুগ্রহ ও পুরস্কারের আশায় বসেছিল, অন্য লোকেরা যখন তা লাভ করে ধন্য হলো এবং আরবের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক মহান নবীর আবির্ভাবের মাধ্যমে এমন এক আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাস্তব জীবনধারার উদ্ভব হলো, যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে উত্থান, উন্নতি ও অগ্রগতি, তখন তারা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। আর এই হিংসার কারণেই তাদের মুখ থেকে এসব কথা বের হচ্ছে।

৮৬. 'বিরাট রাজত্ব' মানে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব। আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান লাভ করার এবং সেই জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করার অনিবার্য ফল স্বরূপ পৃথিবীর জাতিদের নেতৃত্ব দান করার এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা অর্জিত হয়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي
الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ
اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রসূলের আর সেই সব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে তাকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।*[৮৯] *যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান এনে থাকো। এটিই একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটিই উৎকৃষ্ট।*[৯০]

৮৭. মনে রাখতে হবে, এখানে বনী ইসরাঈলদের হিংসা ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের জবাব দেয়া হচ্ছে। এই জবাবের অর্থ হচ্ছে, তোমরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছো কেন? তোমরাও ইবরাহীমের সন্তান। আর এই বনী ইসরাঈলরাও তো ইবরাহীমের সন্তান। দুনিয়ার নেতৃত্ব দানের জন্য ইবরাহীমের কাছে আমি যে ওয়াদা করেছিলাম তা ইবরাহীম সন্তানদের মধ্য থেকে কেবল মাত্র তাদের জন্য ছিল যারা আমার প্রদত্ত কিতাব ও হিকমত তথা শরীয়াত বিধান মেনে চলবে। এই কিতাব ও হিকমত প্রথমে আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য তোমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো। এখন সেই জিনিসটিই আমি বনী ইসমাঈলকে দিয়েছি। তারা এর ওপর ঈমান এনেছে, এটি তাদের সৌভাগ্য।

৮৮. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলরা যেসব খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে তোমরা সেগুলো থেকে দূরে থেকো। বনী ইসরাঈলদের একটি মৌলিক দোষ ছিল এই যে, তারা নিজেদের পতনের যুগে আমানতসমূহ অর্থাৎ দায়িত্বপূর্ণ পদ, ধর্মীয় নেতৃত্ব ও জাতীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ পদসমূহ (Positions of trust) এমন সব লোকদেরকে দেয়া শুরু করেছিল যারা ছিল অযোগ্য, সংকীর্ণমনা, দুশ্চরিত্র, দুর্নীতিপরায়ণ, খেয়ানতকারী ও ব্যভীচারী। ফলে অসৎ লোকদের নেতৃত্বে সমগ্র জাতি অনাচারে লিপ্ত হয়ে গেছে। মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তোমরা এই বনী ইসরাঈলদের মতো আচরণ করো না। বরং তোমরা যোগ্য লোকদেরকে আমানত সোপর্দ করো। অর্থাৎ আমানতের বোঝা বহন করার ক্ষমতা যাদের আছে কেবল তাদের হাতে আমানত তুলে দিয়ো। বনী ইসরাঈলদের দ্বিতীয় বড় দুর্বলতা এই ছিল যে, তাদের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির প্রাণশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থে তারা নির্দ্বিধায় ঈমান বিরোধী কাজ করে চলতো। সত্যকে জেনেও সুস্পষ্ট হঠধর্মীতায় লিপ্ত হতো। ইনসাফের গলায় ছুরি চালাতে কখনো একটুও কুণ্ঠা বোধ করতো না। সে যুগের মুসলমানরা তাদের বেইনসাফীর তিক্ত অভিজ্ঞতা হাতে কলমে লাভ করে চলছিল। একদিকে তাদের সামনে ছিল মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর ওপর যারা ঈমান এনেছিল তাদের পূতপবিত্র জীবনধারা। অন্যদিকে ছিল এমন এক জনগোষ্ঠীর জীবন যারা মূর্তিপূজা করে চলছিল। তারা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো। বিমাতাদেরকেও বিয়ে করতো। উলংগ অবস্থায় কাবা ঘরের চারদিকে তওয়াফ করতো। এই তথাকথিত আহলি কিতাবরা এদের মধ্য থেকে প্রথম দলটির ওপর দ্বিতীয় দলটিকে প্রাধান্য দিতো। তারা একথা বলতে একটুও লজ্জা অনুভব করতো না যে, প্রথম দলটির তুলনায় দ্বিতীয় দলটি অধিকতর সঠিক পথে চলছে। মহান আল্লাহ তাদের এই বেইনসাফির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর এবার মুসলমানদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা ওদের মতো অবিচারক হয়ো না। কারো সাথে বন্ধুতা বা শত্রুতা যাই হোক না কেন সব অবস্থায় ইনসাফ ও ন্যায়নীতির কথা বলবে এবং ইনসাফ ও সুবিচার সহকারে ফায়সালা করবে।

৮৯. এ আয়াতটি ইসলামের সমগ্র ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের বুনিয়াদ। এটি একটি ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের প্রথম নম্বর ধারা। এখানে নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলো স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছে।

এক ঃ ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আসল আনুগত্য লাভের অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ। একজন মুসলমানের সর্বপ্রথম পরিচয় হচ্ছে সে আল্লাহর বান্দা। এরপর সে অন্য কিছু। মুসলমানের ব্যক্তিগত জীবন এবং মুসলমানদের সমাজ ব্যবস্থা উভয়ের কেন্দ্র ও লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য করা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর নির্দেশ মেনে চলা। অন্যান্য আনুগত্য ও অনুসৃতি কেবল মাত্র তখনই গৃহীত হবে যখন তা আল্লাহর আনুগত্য ও অনুসৃতির বিপরীত হবে না। বরং তার অধীন ও অনুকূল হবে। অন্যথায় এই আসল ও মৌলিক আনুগত্য বিরোধী প্রতিটি আনুগত্য শৃংখলকে ভেঙ্গে দূরে নিক্ষেপ করা হবে। একথাটিকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত বক্তব্যে পেশ করেছেন ঃ

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

অর্থাৎ "স্রষ্টার নাফরমানি করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।"

দুই ঃ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে, রসূলের আনুগত্য। এটি কোন স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আনুগত্য নয়। বরং আল্লাহর আনুগত্যের এটিই একমাত্র বাস্তব ও কার্যকর পদ্ধতি। রসূলের আনুগত্য এ জন্য করতে হবে যে, আল্লাহর বিধান ও নির্দেশ আমাদের কাছে পৌঁছার তিনিই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। আমরা কেবলমাত্র রসূলের আনুগত্য করার পথেই আল্লাহর আনুগত্য করতে পারি। রসূলের সনদ ও প্রমাণপত্র ছাড়া আল্লাহর কোন আনুগত্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর রসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামান্তর। নিম্নোক্ত হাদীসে এই বক্তব্যটিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ

مَنْ اَطَاعَنِى فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আসলে আল্লাহর আনুগত্য করলো এবং যে ব্যক্তি আমার নাফরমানি করলো সে আসলে আল্লাহর নাফরমানি করলো।"

একথাটিই কুরআনে সামনের দিকে পুরোপুরি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে পেশ করা হয়েছে।

তিন ঃ উপরোল্লিখিত দু'টি আনুগত্যের পর তাদের অধীনে তৃতীয় আর একটি আনুগত্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আওতাধীনে মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব। সেটি হচ্ছে মুসলমানদের মধ্য থেকে 'উলিল আমর' তথা দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারীদের আনুগত্য। মুসলমানদের সামাজিক ও সামষ্টিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে দায়িত্ব সম্পন্ন ও নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি মাত্রই 'উলিল আমর'–এর অন্তরভুক্ত। তারা মুসলমানদের মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাগত ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী উলামায়ে কেরাম বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হতে পারেন, আবার দেশের শাসনকার্য পরিচালনাকারী প্রশাসকবৃন্দ হতে পারেন, অথবা আদালতে বিচারের রায় প্রদানকারী বিচারপতি বা তামাদ্দুনিক ও সামাজিক বিষয়ে গোত্র, মহল্লা ও জনবসতির নেতৃত্বদানকারী শেখ সরদার প্রধানও হতে পারেন। মোটকথা যে ব্যক্তি যে কোন পর্যায়েই মুসলমানদের নেতৃত্বদানকারী হবেন তিনি অবশ্যি আনুগত্য লাভের অধিকারী হবেন। তার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে মুসলমানদের সামাজিক জীবনে বাধা–বিপত্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা যাবে না। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, তাকে মুসলিম দলভুক্ত হতে হবে এবং আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হতে হবে। এই আনুগত্যের জন্য এই শর্ত দু'টি হচ্ছে অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক। কেবলমাত্র উল্লেখিত আয়াতটির মধ্যভাগে এ সুস্পষ্ট শর্তটি সংশ্লিষ্ট হয়নি বরং হাদীসেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিপূর্ণ ব্যাপকতার সাথে দ্ব্যর্থহীনভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। যেমন নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দেখা যেতে পারে ঃ

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْ مَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ (بخارى ومسلم)

"নিজের নেতৃবৃন্দের কথা শোনা ও মেনে চলা মুসলমানের জন্য অপরিহার্য, তা তার পছন্দ হোক বা না হোক, যে পর্যন্ত না তাকে নাফরমানির হুকুম দেয়া হয়। আর যখন তাকে নাফরমানির হুকুম দেয়া হয় তখন তার কিছু শোনা ও আনুগত্য করা উচিত নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

لاَ طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةٍ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ (بخارى ومسلم)

"আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানির ক্ষেত্রে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য করতে হবে শুধুমাত্র 'মারূফ' বা বৈধ ও সৎকাজে।" (বুখারী ও মুসলিম)

يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ فَقَالُوْا اَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ لاَ مَا صَلُّوْا (مسلم)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের ওপর এমন সব লোকও শাসন কর্তৃত্ব চালাবে যাদের অনেক কথাকে তোমরা 'মারূফ' (বৈধ) ও অনেক কথাকে 'মুনকার' (অবৈধ) পাবে। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তাদের মুনকারের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে, সে দায়মুক্ত হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করেছে, সেও বেঁচে গেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তার অনুসরণ করেছে সে পাকড়াও হবে।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, "তাহলে এ ধরনের শাসকদের শাসনামলে কি আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না?" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দেন ঃ "না, যতদিন তারা নামায পড়তে থাকবে (ততদিন তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না)।"—(মুসলিম)

অর্থাৎ নামায পরিত্যাগ করা এমন একটি আলামত হিসেবে বিবেচিত হবে, যা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, তারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে। এ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ন্যায়সংগত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

شَرَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تَبْغَضُوْنَهُمْ وَيَبْغَضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ لاَ مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلٰوةَ ، لاَ مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلٰوةَ – (مسلم)

"তোমাদের নিকৃষ্টতম সরদার হচ্ছে তারা যারা তোমাদেরকে ঘৃণা করে এবং তোমরা তাদেরকে ঘৃণা করো, তোমরা তাদের প্রতি লানত বর্ষণ করতে থাকো এবং তারা তোমাদের প্রতি লানত বর্ষণ করতে থাকে। সাহাবীগণ আরজ করেন, হে আল্লাহর রসূল। যখন এ অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন কি আমরা তাদের মোকাবিলা করার জন্য মাথা তুলে দাঁড়াবো না? জবাব দেন ঃ না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করতে থাকবে। না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করতে থাকবে!"

এই হাদীসটি ওপরে বর্ণিত শর্তটিকে আরো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। ওপরের হাদীসটি থেকে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, যতদিন তারা ব্যক্তিগত জীবনে নামায পড়তে থাকবে ততদিন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কিন্তু এই হাদীসটি থেকে একথা জানা যায় যে, নামায পড়া মানে আসলে মুসলমানদের সমাজ জীবনে নামাযের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ কেবলমাত্র তাদের নিজেদের নিয়মিতভাবে নামায পড়াটাই যথেষ্ট হবে না বরং এই সংগে তাদের আওতাধীনে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে সেখানেও কমপক্ষে 'ইকামাতে সালাত' তথা নামায প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপনা থাকা জরুরী বিবেচিত হবে। তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার আসল প্রকৃতির দিক দিয়ে যে একটি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এটি হবে তারই একটি আলামত। অন্যথায় যদি এতটুকুও না হয়, তাহলে এর অর্থ হবে যে, তারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের শাসন ব্যবস্থাকে উলটে ফেলার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো মুসলমানদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে। একথাটিকেই অন্য একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে অন্যান্য আরো বিভিন্ন বিষয়ের সাথে এ ব্যাপারেও অংগীকার নিয়েছেন ঃ

أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

"অর্থাৎ আমরা আমাদের সরদার ও শাসকদের সাথে ঝগড়া করবো না, তবে যখন আমরা তাদের কাজে প্রকাশ্য কুফরী দেখতে পাবো যার উপস্থিতিতে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে পেশ করার জন্য আমাদের কাছে প্রমাণ থাকবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

চার ঃ চতুর্থ যে মূলনীতিটি এ আয়াতটি থেকে স্থায়ী ও চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আল্লাহর হুকুম ও রসূলের সুন্নাত হচ্ছে মৌলিক আইন ও চূড়ান্ত সনদ (Final Authority) মুসলমানদের মধ্যে অথবা মুসলিম সরকার ও প্রজাদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসার জন্য কুরআন ও সুন্নাতের দিকে ফিরে আসতে হবে। কুরআন ও সুন্নাত এ ব্যাপারে যে ফায়সালা দেবে তার সামনে মাথা নত করে দিতে হবে। এভাবে জীবনের সকল ব্যাপারে কুরআন ও রসূলের সুন্নাতকে সনদ, চূড়ান্ত ফায়সালা ও শেষকথা হিসেবে মেনে নেয়ার বিষয়টি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা তাকে কুফরী জীবন ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। যে ব্যবস্থায় এ জিনিসটি অনুপস্থিত থাকে সেটি আসলে একটি অনৈসলামী ব্যবস্থা।

এ প্রসংগে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করে বলে থাকেন যে, জীবনের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালার জন্য কুরআন ও সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়া কিভাবে সম্ভব হতে পারে? কারণ মিউনিসিপ্যালিটি, রেলওয়ে, ডাকঘর ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় সম্পর্কিত কোন নিয়ম-কানুনের উল্লেখই সেখানে নেই। কিন্তু এ সংশয়টি আসলে দীনের মূলনীতি সঠিকভাবে অনুধাবন না করার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। একজন মুসলমানকে একজন কাফের থেকে যে বিষয়টি আলাদা ও বৈশিষ্ট মণ্ডিত করে সেটি হচ্ছে, কাফের অবাধ স্বাধীনতার দাবীদার। আর মুসলমান মূলত আল্লাহর বান্দা ও দাস হবার পর তার রব মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে যতটুকু স্বাধীনতা দান করেছেন শুধুমাত্র ততটুকুই স্বাধীনতা ভোগ করে। কাফের তার নিজের তৈরী মূলনীতি ও আইন-বিধানের মাধ্যমে তার যাবতীয় বিষয়ের মীমাংসা করে। এসব মূলনীতি ও বিধানের ক্ষেত্রে কোন ঐশী সমর্থন ও স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করে না এবং নিজেকে সে এর মুখাপেক্ষীও ভাবে না। বিপরীত পক্ষে মুসলমান তার প্রতিটি ব্যাপারে সর্বপ্রথম আল্লাহ ও তাঁর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিকে ফিরে যায়। সেখান থেকে কোন নির্দেশ পেলে সে তার অনুসরণ করে। আর কোন নির্দেশ না পেলে কেবল মাত্র এই অবস্থায়ই সে স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। এ ক্ষেত্রে তার এই কর্মের স্বাধীনতার মূলভিত্তি একথার ওপরই স্থাপিত হয় যে, এই ব্যাপারে শরীয়াত রচয়িতার পক্ষ থেকে কোন বিধান না দেয়াই একথা প্রমাণ করে যে তিনি এ ক্ষেত্রে কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ⑥

৯ রুকূ'

*হে নবী! তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা এই মর্মে দাবী করে চলছে যে, তারা ঈমান এনেছে সেই কিতাবের প্রতি যা তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং সেই সব কিতাবের প্রতি যেগুলো তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল; কিন্তু তারা নিজেদের বিষয়সমূহের ফায়সালা করার জন্য 'তাগুতে'র দিকে ফিরতে চায়, অথচ তাদেরকে তাগুতকে অস্বীকার করার হুকুম দেয়া হয়েছিল?[৯১] —শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সরল সোজা পথ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।*

৯০. কুরআন মজীদ যেহেতু নিছক একটি আইনের কিতাব মাত্র নয় বরং একই সংগে এটি একটি শিক্ষা ও উপদেশমূলক গ্রন্থও, তাই প্রথম বাক্যে যে আইনগত মূলনীতির বিবরণ দেয়া হয়েছিল এই দ্বিতীয় বাক্যে তার অন্তরনিহিত কারণ ও যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দু'টি কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, উপরোল্লিখিত চারটি মূলনীতি মেনে চলা ঈমানের অপরিহার্য দাবী। একদিকে মুসলমান হবার দাবী করা এবং অন্যদিকে এই মূলনীতিগুলো উপেক্ষা করা, এ দু'টি পরস্পর বিরোধী জিনিসের কখনো একত্র সমাবেশ হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এই মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতে নিজেদের জীবন বিধান নির্মাণ করার মধ্যেই মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত। কেবলমাত্র এই একটি জিনিসই তাদেরকে দুনিয়ায় সত্য–সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে এবং এর মাধ্যমেই তারা পরকালেও সফলকাম হতে পারে। যে ভাষণে ইহুদীদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার ওপর মন্তব্য করা হচ্ছিল এই উপদেশ বাণীটি ঠিক তার শেষে উক্ত হয়েছে। এভাবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাত দীনের এই মূলনীতিগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে যেভাবে অধপতনের গভীর গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। যখন কোন জনগোষ্ঠী আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের হিদায়াত পেছনে ফেলে দিয়ে এমন সব নেতা ও সরদারের আনুগত্য করতে থাকে, যারা আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মেনে চলে না এবং নিজেদের ধর্মীয় নেতা ও রাষ্ট্রীয় শাসকদের কাছে কুরআন ও সুন্নাতের সনদ ও প্রমাণপত্র জিজ্ঞেস না করেই তাদের আনুগত্য করতে থাকে তখন তারা এই বনী ইসরাঈলদের মতোই অসৎ ও অনিষ্টকর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে এমন সব দোষ–ত্রুটি সৃষ্টি হয়ে যায়, যার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ۝٦١ فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ۝٦٢

*আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো সেই জিনিসের দিকে, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং এসো রসূলের দিকে, তখন তোমরা দেখতে পাও ঐ মুনাফিকরা তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।[৯২] তারপর তখন তাদের কী অবস্থা হয় যখন তাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ তাদের ওপর কোন বিপদ এসে পড়ে? তখন তারা কসম খেতে খেতে তোমার কাছে আসে[৯৩] এবং বলতে থাকে : আল্লাহর কসম, আমরা তো কেবল মংগল চেয়েছিলাম এবং উভয় পক্ষের মধ্যে কোন প্রকারে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক, এটিই ছিল আমাদের বাসনা।*

৯১. এখানে 'তাগুত' বলতে সুস্পষ্টভাবে এমন শাসককে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং এমন বিচার ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার আনুগত্য করে না এবং আল্লাহর কিতাবকে চূড়ান্ত সনদ (Final Authority) হিসেবে স্বীকৃতিও দেয় না। কাজেই যে আদালত তাগুতের ভূমিকা পালন করছে, নিজের বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালার জন্য তার কাছে উপস্থিত হওয়া যে একটি ঈমান বিরোধী কাজ, এ ব্যাপারে এ আয়াতটির বক্তব্য একেবারে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। আর আল্লাহ ও তাঁর কিতাবের ওপর ঈমান আনার অপরিহার্য দাবি অনুযায়ী এ ধরনের আদালতকে বৈধ আদালত হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানানোই প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য। কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তাগুতকে অস্বীকার করা, এ দু'টি বিষয় পরস্পরের সাথে অংগাংগীভাবে সংযুক্ত এবং এদের একটি অন্যটির অনিবার্য পরিণতি। আল্লাহ ও তাগুত উভয়ের সামনে একই সাথে মাথা নত করাই হচ্ছে সুস্পষ্ট মুনাফেকী।

৯২. এথেকে জানা যায়, মুনাফিকদের সাধারণ রীতি ছিল, যে মামলার ব্যাপারে তারা আশা করতো যে, ফায়সালা তাদের পক্ষে যাবে সেটি তারা নিয়ে আসতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিন্তু যে মামলাটির ফায়সালা তাদের বিপক্ষে যাবে বলে তারা আশংকা করতো সেটি তাঁর কাছে আনতে অস্বীকার করতো। বর্তমান কালের বহু মুনাফিকেরও এই একই অবস্থা। শরীয়াতের ফায়সালা যদি তাদের অনুকূল হয় তাহলে তারা নত মস্তকে তা মেনে নেয়। অন্যথায় যে আইন, প্রচলিত রীতি–রেওয়াজ ও

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ
وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا
لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
رَحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

*—আল্লাহ জানেন তাদের অন্তরে যা কিছু আছে। তাদের পেছনে লেগো না, তাদেরকে বুঝাও এবং এমন উপদেশ দাও, যা তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যায়। (তাদেরকে জানিয়ে দাও) আমি যে কোন রসূলই পাঠিয়েছি, এ উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে।[৭৪] আর যদি তারা এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতো যার ফলে যখন তারা নিজেদের ওপর জুলুম করতো তখন তোমার কাছে এসে যেতো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতো আর রসূলও তাদের জন্য ক্ষমার আবেদন করতো, তাহলে নিসন্দেহে তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল হিসেবে পেতো। না, হে মুহাম্মাদ! তোমার রবের কসম, এরা কখনো মু'মিন হতে পারে না যতক্ষণ এদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে এরা তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেবে, তারপর তুমি যা ফায়সালা করবে তার ব্যাপারে নিজেদের মনের মধ্যে কোন প্রকার কুণ্ঠা ও দ্বিধার স্থান দেবে না, বরং সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।[৭৫]*

আদালতের মাধ্যমে তারা নিজেদের মন–মাফিক ফায়সালা লাভের আশা রাখে, তারই কোলে তারা আশ্রয় নেয়।

৯৩. সম্ভবত এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যখন মুসলমানরা তাদের মুনাফেকী কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে পারে এবং তার জবাবদিহি করার ও শাস্তিলাভের আশংকা করতে থাকে তখন কসম খেয়ে খেয়ে নিজেদের ঈমানের নিশ্চয়তা দিতে থাকে।

৯৪. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল এ জন্য আসেন না যে, কেবল তাঁর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনতে হবে তারপর ইচ্ছেমতো যে কারো আনুগত্য করা যাবে। বরং রসূলের আগমনের উদ্দেশ্যই এই হয় যে, জীবন যাপনের জন্য যে আইন কানুন তিনি আনেন

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

*যদি আমি তাদের হুকুম দিতাম, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো অথবা নিজেদের ঘর থেকে বের হয়ে যাও, তাহলে তাদের খুব কম লোকই এটাকে কার্যকর করতো।[৯৬] অথচ তাদেরকে যে নসীহত করা হয় তাকে যদি তারা কার্যকর করতো তাহলে এটি হতো তাদের জন্য অধিকতর ভালো ও অধিকতর দৃঢ়তা ও অবিচলতার প্রমাণ।[৯৭] আর এমনটি করলে আমি নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে অনেক বড় পুরস্কার দিতাম এবং তাদেরকে সত্য সরল পথ দেখাতাম।[৯৮]*

দুনিয়ার সমস্ত আইন কানুন বাদ দিয়ে কেবল মাত্র তারই অনুসরণ করতে হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যে বিধান দেন সমস্ত বিধান ত্যাগ করে একমাত্র তাকেই কার্যকর করতে হবে। যদি কেউ এ কাজে ব্রতী না হয়, তাহলে তার নিছক রসূলকে রসূল মেনে নেয়া অর্থহীন হয়ে পড়ে।

৯৫. এই আয়াতে দেয়া নির্দেশটি কেবল মাত্র রসূলের জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত এটি কার্যকর হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছ থেকে যা কিছু এনেছেন এবং আল্লাহর হেদায়াত ও পথপ্রদর্শনের ভিত্তিতে যে পদ্ধতিতে তিনি কাজ করেছেন, তা চিরস্থায়ীভাবে মুসলমানদের জন্য চূড়ান্ত ফায়সালাকারী সনদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই সনদটি মানা ও নামানার ওপরই কোন ব্যক্তির মু'মিন হওয়া ও না হওয়া নির্ভর করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে একথাটিই এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ

"তোমাদের কোন ব্যক্তি মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যে পদ্ধতির প্রবর্তন করেছি তার অধীনতা স্বীকার করে নেবে।"

৯৬. অর্থাৎ যখন তারা শরীয়াত মেনে চলতে গিয়ে সামান্যতম ক্ষতি বা কষ্ট বরদাশত করতে পারে না তখন তাদের কাছ থেকে কোন বড় রকমের ত্যাগ ও কুরবানীর আশা কোনক্রমেই করা যেতে পারে না। তাদের কাছে যদি প্রাণদান বা ঘর বাড়ি পরিত্যাগ করার দাবী করা হয় তাহলে তারা সংগে সংগেই সটকে পড়বে এবং ঈমান ও আনুগত্যের পরিবর্তে কুফরী ও নাফরমানির পথ অবলম্বন করবে।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿٧٠﴾

*যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে সে তাদের সহযোগী হবে, যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে।*[৯৯] *মানুষ যাদের সংগ লাভ করতে পারে তাদের মধ্যে এরা কতই না চমৎকার সংগী।*[১০০] *আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া এই হচ্ছে প্রকৃত অনুগ্রহ এবং যথার্থ সত্য জানার জন্য একমাত্র আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট।*

৯৭. অর্থাৎ যদি এরা সন্দেহ সংশয় ও দ্বিধার পথ পরিহার করে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে রসূলের আনুগত্যের পথে এগিয়ে চলতো এবং কোন অবস্থায় দোদুল্যমান না হতো, তাহলে এদের জীবন অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা মুক্ত হতো। এদের চিন্তা-ভাবনা, নীতি-নৈতিকতা, লেনদেন সবকিছুই একটি স্থায়ী ও সুদৃঢ় বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো। একটি সত্য-সরল রাজপথে দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে এগিয়ে চলার ফলে যে সাফল্য ও সমৃদ্ধি অর্জিত হয় তা তারা অর্জন করতে সক্ষম হতো। যে ব্যক্তি দ্বিধা ও দোদুল্যমান অবস্থার শিকার হয়, কখনো এ পথে কখনো ওপথে চলে এবং কোন একটি পথের নির্ভুলতা সম্পর্কে তার মনে আস্থারভাব জাগে না, তার সারাটা জীবন কাটে কচু পাতায় রাখা পানির মতো অবস্থায় এবং তার সারা জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৯৮. অর্থাৎ যখন তারা সংশয় পরিহার করে ঈমান ও নিশ্চিত বিশ্বাস সহকারে রসূলের আনুগত্য করার ফায়সালা করে তখন আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের সামনে প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের সরল-সোজা পথ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন নিজেদের শক্তি ও মেহনত যে পথে ব্যবহার করলে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ আসল মনযিলে মাকসূদের দিকে এগিয়ে যাবে সে পথটি তারা পরিষ্কার দেখতে পায়।

৯৯. সিদ্দীক বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যে পরম সত্যনিষ্ঠ ও সত্যবাদী। তার মধ্যে সততা ও সত্যপ্রিয়তা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত থাকে। নিজের আচার-আচরণ ও লেনদেনে সে হামেশা সুস্পষ্ট ও সরল সোজা পথ অবলম্বন করে। সে সবসময় সাচ্চা দিলে হক ও ইনসাফের সহযোগী হয়। সত্য ও ন্যায়নীতি বিরোধী যে কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে সে পর্বত সমান অটল অস্তিত্ব নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে সামান্যতম দুর্বলতাও দেখায় না। সে এমনই পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হয় যে, তার আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধু-শত্রু, আপন-পর কেউই তার কাছ থেকে নির্লজ্জ ও নিখাদ সত্যপ্রীতি, সত্য-সমর্থন ও সত্য-সহযোগিতা ছাড়া আর কিছুরই আশংকা করে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا
جَمِيْعًا ﴿٧١﴾ وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ
قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ
فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ
كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٣﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۭ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٧٤﴾

১০ রুকূ’

*হে ঈমানদারগণ। মোকাবিলা করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকো।[১০১] তারপর সুযোগ পেলে পৃথক পৃথক বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে বের হয়ে পড়ো অথবা এক সাথে। হ্যাঁ, তোমাদের কেউ কেউ এমনও আছে যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে গড়িমসি করে।[১০২] যদি তোমাদের ওপর কোন মুসিবত এসে পড়ে তাহলে সে বলে আল্লাহ আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন, আমি তাদের সাথে যাইনি। আর যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, তাহলে সে বলে—এবং এমনভাবে বলে যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোন প্রীতির সম্পর্ক ছিলই না, —হায়! যদি আমিও তাদের সাথে হতাম তাহলে বিরাট সাফল্য লাভ করতাম। (এই ধরনের লোকদের জানা উচিত) আল্লাহর পথে তাদের লড়াই করা উচিত যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিকিয়ে দেয়।[১০৩] তারপর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়বে এবং মারা যাবে অথবা বিজয়ী হবে তাকে নিশ্চয়ই আমি মহাপুরস্কার দান করবো।*

শহীদ শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে সাক্ষী। শহীদ বলতে এমন ব্যক্তি বুঝায় যে নিজের জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তার ঈমানের সত্যতার সাক্ষ প্রদান করে। আল্লাহর পথে লড়াই করে প্রাণ উৎসর্গকারীকেও এ কারণেই শহীদ বলা হয় যে, সে প্রাণ উৎসর্গ করে একথা প্রমাণ করে দেয় যে, সে যে জিনিসের ওপর ঈমান এনেছিল তাকে যথার্থই সাচ্চা দিলে সত্য মনে করতো এবং তা তার কাছে এত বেশী প্রিয় ছিল যে, তার জন্য নিজের প্রাণ অকাতরে বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করেনি। আবার এমন ধরনের সত্যনিষ্ঠ

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۤءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَاۤءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾

*তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহর পথে অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য লড়বে না, যারা দুর্বলতার কারণে নির্যাতীত হচ্ছে? তারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা জালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কোন বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী তৈরী করে দাও।[১০৪] যারা ঈমানের পথ অবলম্বন করেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের পথে।[১০৫] কাজেই শয়তানের সহযোগীদের সাথে লড়ো এবং নিশ্চিত জেনে রাখো, শয়তানের কৌশল আসলে নিতান্তই দুর্বল।[১০৬]*

ব্যক্তিদেরকেও শহীদ বলা হয় যারা এতই নির্ভরযোগ্য হয় যে, তারা কোন বিষয়ে সাক্ষ দিলে তাকে নির্দ্বিধায় সত্য ও সঠিক বলে স্বীকার করে নেয়া হয়।

সালেহ বা সৎকর্মশীল বলতে এমন ব্যক্তি বুঝায় যে তার নিজের চিন্তাধারা, আকীদা-বিশ্বাস, ইচ্ছা, সংকল্প, কথা ও কর্মের মাধ্যমে সত্য-সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং এই সংগে নিজের জীবনে সৎ ও সুনীতি অবলম্বন করে।

১০০. অর্থাৎ দুনিয়ায় যারা এ ধরনের লোকদের সংগ লাভ করে এবং আখেরাতেও এদের সাথী হয় তারা বড়ই সৌভাগ্যবান। অবশ্যি কোন ব্যক্তির অনুভূতি মরে গেলে ভিন্ন কথা, নয়তো অসৎ ও দুশ্চরিত্র লোকদের সাথে দুনিয়ায় জীবন যাপন করা আসলে একটি ভয়াবহ শাস্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। আর আখেরাতে তারা যে পরিণামের সম্মুখীন হবে সেই একই পরিণামের ভাগী হয়ে আখেরাতে তাদের সাথী হওয়ার শাস্তি তো তুলনা বিহীন। তাই তো আল্লাহর নেক্কার বান্দারা হামেশা এই আকাংখা পোষণ করে যে, তারা যেন নেক লোকদের সমাজে বসবাস করতে পারে এবং মৃত্যুর পরও যেন তাদেরই সাথে থাকে।

১০১. উল্লেখ্য এ ভাষণটি এমন এক সময় নাযিল হয়েছিল যখন ওহোদ যুদ্ধের পরাজয়ের পর মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার গোত্রগুলোর সাহস বেড়ে গিয়েছিল এবং বিপদ আপদ চতুর্দিক থেকে মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলেছিল। সে সময় প্রায় প্রতিদিনই নানান ধরনের দুঃসংবাদ আসতো। উমুক গোত্র বিরূপ হয়ে গেছে। উমুক গোত্র শত্রুতা শুরু করে দিয়েছে। উমুক জায়গায় আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে। মুসলমানদের সাথে এক নাগাড়ে বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছিল। তাদের প্রচারকদেরকে দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে দাওয়াত দিয়ে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা হতো। মদীনার বাইরে তাদের জানমালের কোন নিরাপত্তা ছিল না। এ অবস্থায় এসব বিপদের ঢেউয়ের আঘাতে যাতে ইসলামের তরী ডুবে না যায় সেজন্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে একটি জোরদার প্রচেষ্টা ও জীবন উৎসর্গকারী সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজন ছিল।

১০২. এর এক অর্থ এও হতে পারে যে, নিজে তো গড়িমসি করেই এমন কি অন্যদেরকেও হিম্মতহারা করে দেয়, তাদের বুকে ভয় ঢুকিয়ে দেয় এবং জিহাদ বন্ধ করার জন্য এমন ধরনের কথা বলতে থাকে যার ফলে তারা নিজেদের জায়গায় চুপচাপ বসে থাকে।

১০৩. অর্থাৎ আল্লাহর পথে লড়াই করা দুনিয়ার লাভ ও দুনিয়ার স্বার্থ পূজারী লোকদের কাজ নয়। এটা এমন এক ধরনের লোকের কাজ যারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখে এবং নিজেদের পার্থিব প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির সমস্ত সম্ভাবনা ও সব ধরনের পার্থিব স্বার্থ একমাত্র আল্লাহর জন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাদের রব যেন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং এই দুনিয়ায় তাদের ত্যাগ ও কুরবানী বিফল হয়ে গেলেও আখেরাতেও যেন বিফলে না যায়।

১০৪. এখানে এমন সব মজলুম শিশু, নারী ও পুরুষদের দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যারা মক্কায় ও আরবের অন্যান্য গোত্রের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাদের হিজরত করার শক্তি ছিল না এবং নিজেদেরকে কাফেরদের জুলুম–নির্যাতন থেকে রক্ষা করার ক্ষমতাও ছিল না। এদের ওপর বিভিন্ন প্রকার জুলুম চালানো হচ্ছিল। কেউ এসে তাদেরকে এই জুলুমের সাগর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে, এই ছিল তাদের দোয়া ও প্রত্যাশা।

১০৫. এটি আল্লাহর একটি দ্ব্যর্থহীন ফায়সালা। আল্লাহর পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে লড়াই করা হচ্ছে ঈমানদারদের কাজ। যথার্থ ও সত্যিকার মু'মিন এই কাজ থেকে কখনো বিরত থাকবে না। আর আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহ বিরোধী ও আল্লাহদ্রোহীদের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাগুতের পথে লড়াই করা হচ্ছে কাফেরদের কাজ। কোন ঈমানদার ব্যক্তি এ কাজ করতে পারে না।

১০৬. অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে শয়তান ও তার সাথীরা বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসে এবং জবরদস্ত কৌশল অবলম্বন করে কিন্তু তাদের প্রস্তুতি ও কৌশল দেখে ঈমানদারদের ভীত হওয়া উচিত নয় অবশ্যি তাদের সকল প্রস্তুতি ও কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَآتُوا الزَّكَوٰةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

১১ রুকূ'

*তোমরা কি তাদেরকেও দেখেছো, যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখো এবং নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও? এখন তাদেরকে যুদ্ধের হুকুম দেয়ায় তাদের একটি দলের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, তারা মানুষকে এমন ভয় করছে যেমন আল্লাহকে ভয় করা উচিত অথবা তার চেয়েও বেশী।[১০৭] তারা বলছে ঃ হে আমাদের রব! আমাদেব জন্য এই যুদ্ধের হুকুমনামা কেন লিখে দিলে? আমাদের আরো কিছু সময় অবকাশ দিলে না কেন? তাদেরকে বলো ঃ দুনিয়ার জীবন ও সম্পদ অতি সামান্য এবং একজন আল্লাহর ভয়ে ভীত মানুষের জন্য আখেরাতই উত্তম। আর তোমাদের ওপর এক চুল পরিমাণও জুলুম করা হবে না।[১০৮]*

১০৭. এই আয়াতটির তিনটি অর্থ হয়। এই তিনটি অর্থই তাদের নিজস্ব পরিসরে যথার্থ ও নির্ভুল ঃ

এর একটি অর্থ হচ্ছে, প্রথমে লোকেরা নিজেরাই যুদ্ধ করার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল। বারবার বলতো ঃ আমাদের ওপর জুলুম করা হচ্ছে। নিপীড়ন নির্যাতন চালানো হচ্ছে। মারপিট করা হচ্ছে। গালি গালাজ করা হচ্ছে। আমরা আর কতদিন সবর করবো? আমাদের মোকাবিলা করার অনুমতি দেয়া হোক। সে সময় তাদেরকে বলা হতো, সবর করো এবং নামায ও যাকাতের মাধ্যমে নিজেদের সংশোধন করতে থাকো। তখন এই সবর ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করার হুকুম পালন করা তাদের জন্য বড়ই কষ্টকর হতো। কিন্তু এখন লড়াই করার হুকুম দেবার পর সেই লড়াইয়ের দাবীদারদের একটি দল শত্রুদের সংখ্যা ও যুদ্ধের বিপদ দেখে আতংকিত হয়ে পড়ছিল।

দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যতদিন নামায, রোযা এবং এই ধরনের নির্ঝনঝাট ও ঝুঁকিহীন কাজের হুকুম ছিল এবং যুদ্ধ করে প্রাণ দান করার প্রশ্ন সামনে আসেনি ততদিন এরা খাঁটি দীনদার ও ঈমানদার ছিল। কিন্তু এখন সত্যের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার কাজ শুরু হতেই এরা ভীত ও আতংকিত হয়ে পড়ছে।

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

*আর মৃত্যু, সে তোমরা যেখানেই থাকো না কেন সেখানে তোমাদের নাগাল পাবেই, তোমরা কোন মজবুত প্রাসাদে অবস্থান করলেও।*

*যদি তাদের কোন কল্যাণ হয় তাহলে তারা বলে, এতো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আর কোন ক্ষতি হলে বলে, এটা হয়েছে তোমার বদৌলতে।*[১০৭] *বলে দাও, সবকিছুই হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। লোকদের কী হয়েছে, কোন কথাই তারা বোঝে না।*

*হে মানুষ! যে কল্যাণই তুমি লাভ করে থাকো তা আল্লাহর দান এবং যে বিপদ তোমার ওপর এসে পড়ে তা তোমার নিজের উপার্জন ও কাজের বদৌলতেই আসে।*

*হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি এবং এর ওপর আল্লাহর সাক্ষ যথেষ্ট।*

এর তৃতীয় অর্থটি হচ্ছে, প্রথমে তো লুটপাট করার ও নিজের স্বার্থোদ্ধারের লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য তাদের তরবারি সবসময় কোষমুক্ত থাকতো এবং রাতদিন যুদ্ধ-বিগ্রহই ছিল তাদের কাজ। সে সময় তাদেরকে রক্তপাত থেকে বিরত রাখার জন্য নামায ও যাকাতের মাধ্যমে নফসের সংশোধন করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। আর এখন আল্লাহর জন্য তলোয়ার ওঠাবার হুকুম দেবার পর দেখা যাচ্ছে, যারা স্বার্থোদ্ধারের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সিংহ ছিল আল্লাহর জন্য লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তারা হয়ে গেছে বুজদিল কাপুরুষ। নফ্স ও শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যে হাতে ইতিপূর্বে তরবারি ঝল্সে উঠছিল, আল্লাহর পথে তরবারি চালাবার প্রশ্নে সে হাত নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

এ তিনটি অর্থই বিভিন্ন ধরনের লোকদের আচরণের সাথে খাপ খেয়ে যায়। এখানে আয়াতের মধ্যে এমন ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা একই সাথে এই তিনটি অর্থই প্রকাশ করতে সক্ষম।

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝٨٠ وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۡ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ۭ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝٨١ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۭ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۝٨٢

*যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করলো সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিলো, যাই হোক, তাদের ওপর তো আমি তোমাকে পাহারাদার বানিয়ে পাঠাইনি।[১১০]*

*তারা মুখে বলে, আমরা অনুগত ফরমাবরদার। কিন্তু যখন তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায় তখন তাদের একটি দল রাত্রে সমবেত হয়ে তোমার কথার বিরুদ্ধে পরামর্শ করে। আল্লাহ তাদের এই সমস্ত কানকথা লিখে রাখছেন। তুমি তাদের পরোয়া করো না, আল্লাহর ওপর ভরসা করো, ভরসা করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করে না? যদি এটি আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষ থেকে হতো, তাহলে তারা এর মধ্যে বহু বর্ণনাগত অসংগতি খুঁজে পেতো।[১১১]*

১০৮. অর্থাৎ যখন তোমরা আল্লাহর দীনের খেদমত করবে এবং তাঁর পথে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে থাকবে তখন আল্লাহর কাছে তোমাদের প্রতিদান নষ্ট হয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

১০৯. অর্থাৎ যখন বিজয় ও সাফল্য আসে তখন তাকে আল্লাহর অনুগ্রহ গণ্য করে থাকো এবং একথা ভুলে যাও যে, আল্লাহ তাঁর নবীর মাধ্যমেই এই অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু নিজেদের দুর্বলতা ও ভুলের জন্য কোথাও পরাজয় বরণ করে থাকলে এবং সামনে এগিয়ে যাওয়া পা পিছিয়ে আসতে থাকলে তখন নবীর ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হতে চাও।

১১০. অর্থাৎ তারা নিজেরাই নিজেদের কাজের জন্য দায়ী। তাদের কাজের জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। তোমাকে কেবল এতটুকু কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যে, তুমি আল্লাহর নির্দেশ ও বিধানসমূহ তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। এ কাজটি তুমি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছো। এখন তাদের হাত ধরে জবরদস্তি সত্য–সরল পথে পরিচালিত করা তোমার কাজ নয়। তোমার মাধ্যমে যে হিদায়াত পৌঁছানো হচ্ছে তারা

وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ؕ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۸۳﴾ فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ﴿۸۴﴾

*তারা যখনই কোন সন্তোষজনক বা ভীতিপ্রদ খবর শুনতে পায় তখনই তা চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। অথচ তারা যদি এটা রসূল ও তাদের জামায়াতের দায়িত্বশীল লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, তাহলে তা এমন লোকদের গোচরীভূত হয়, যারা তাদের মধ্যে কথা বলার যোগ্যতা রাখে এবং তা থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।[১১২] তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হতো তাহলে (তোমাদের এমন সব দুর্বলতা ছিল যে) মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া তোমরা সবাই শয়তানের পেছনে চলতে থাকতে।*

*কাজেই হে নবী! তুমি আল্লাহর পথে লড়াই করো। তুমি নিজের সত্তা ছাড়া আর কারো জন্য দায়ী নও। অবশ্যি ঈমানদারদেরকে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করো। আল্লাহ শীঘ্রই কাফেরদের শক্তির মস্তক চূর্ণ করে দেবেন। আল্লাহর শক্তি সবচেয়ে জবরদস্ত এবং তাঁর শাস্তি সবচেয়ে বেশী কঠোর।*

যদি তার অনুসরণ না করে, তাহলে তার কোন দায়–দায়িত্ব তোমার ওপর থাকবে না। তারা কেন নাফরমানি করেছিল, এর জবাবদিহি করার জন্য তোমাকে পাকড়াও করা হবে না।

১১১. মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদার লোকদের যে আচরণ সম্পর্কে ওপরের আয়াতগুলোতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে তার প্রধান ও আসল কারণ ছিল এই যে, কুরআনে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হবার ব্যাপারে তাদের মনে সন্দেহ ছিল। তারা একথা বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, সত্যি সত্যিই রসূলের ওপর অহী নাযিল হয় এবং এই যে হিদায়াতগুলো আসছে, এগুলো সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে আসছে। তাই তাদের মুনাফেকী আচরণের নিন্দা করার পর এখন বলা হচ্ছে, তারা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনাই করে না। কেননা এই গ্রন্থ নিজেই সাক্ষী দিচ্ছে যে, এটি আল্লাহ ছাড়া আর

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾

*যে ব্যক্তি কল্যাণ ও সৎকাজের সুপারিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি অকল্যাণ ও অসৎকাজের সুপাবিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে।[১১৩] আর আল্লাহ সব জিনিসের প্রতি নজর বাখেন।*

*আর যখনই কেউ মর্যাদা সহকারে তোমাকে সালাম করে তখন তাকে তার চাইতে ভালো পদ্ধতিতে জবাব দাও অথবা কমপক্ষে তেমনিভাবে।[১১৪] আল্লাহ সব জিনিসের হিসেব গ্রহণকারী। আল্লাহ তিনিই যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি তোমাদের সবাইকে সেই কিয়ামতের দিন একত্র করবেন, যার আসার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আর আল্লাহর কথার চাইতে বেশী সত্য আর কার কথা হতে পারে?[১১৫]*

কারো বাণী হতেই পারে না। কোন মানুষের ক্ষমতা নেই বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিতে থাকবে এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত ভাষণ একটি সুসামঞ্জস্য, ভারসাম্যপূর্ণ ও এক বর্ণের মোতির মালায় পরিণত হবে। এর কোন অংশ অন্য অংশের সাথে সংঘর্ষশীল হবে না। এর মধ্যে মত পরিবর্তনের কোথাও কোন নাম নিশানাও পাওয়া যাবে না। ভাষণদাতার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানসিক অবস্থার কোন প্রতিফলনও সেখানে দেখা যাবে না। এই ভাষণের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করার কোন প্রশ্নই কখনো উথাপিত হবে না। এই ধরনের ভাষণ দেয়া কোন মানুষের জন্য কোন কালেই সম্ভবপর নয়।

১১২. এ সময় সারা দেশে জরুরী অবস্থা বিরাজ করছিল। তাই চারদিকে নানান ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ছিল। কখনো ভিত্তিহীন অতিরঞ্জিত আশংকার খবর এসে পৌঁছতো। এর ফলে হঠাৎ মদীনা ও তার আশেপাশে ভীতি চড়িয়ে পড়তো। কখনো ধূর্ত শত্রু কোন যথার্থ বিপদকে গোপন করার জন্য সন্তোষজনক খবর পাঠাতো এবং তা শুনে সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্ত ও গাফেল হয়ে পড়তো। এই গুজব ছড়াবার ব্যাপারে নিছক হাংগামাবাজ লোকেরা বড়ই উৎসাহ বোধ করতো। তাদের কাছে ইসলাম ও জাহেলীয়াতের এই সংঘাত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। এই ধরনের দায়িত্বহীন গুজব রটানোর পরিণতি

কত সুদূর প্রসারী হতে পারে সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। তাদের কানে কোন কথা পড়লেই হলো, তারা তাই নিয়ে জায়গায় জায়গায় ফুঁকে দিতে থাকতো। এই আয়াতে এই ধরনের লোকদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং তাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়ে গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকার এবং কোন কিছু শুনলে তা সংগে সংগেই দায়িত্বশীলদের কানে পৌঁছিয়ে দিয়ে পরিপূর্ণ নীরবতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১১৩. অর্থাৎ এটা যার যেমন পছন্দ এবং যার যেমন ভাগ্য। কেউ আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা চালাবার এবং সত্যের শির উঁচু রাখার জন্য লোকদেরকে উৎসাহিত করে—এর পুরস্কারও সে পায়। আবার কেউ মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলার, তাদেরকে নির্বীর্য ও সাহসহীন করার এবং তাদেরকে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম থেকে বিরত রাখার জন্য নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে—এর শাস্তিও সে পায়।

১১৪. সে সময় মুসলিম ও অমুসলিমদের সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। আর সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেলে অবস্থা যেমন দাঁড়ায় অর্থাৎ কোথাও মুসলমানরা যেন অন্যদের সাথে অসদ্ব্যবহার না করে, এর আশংকা দেখা দিয়েছিল। তাই তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যারা তোমাদের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করবে তোমরাও তাদের সাথে তেমনি সম্মানজনক বা তার চাইতেও বেশী সম্মানজনক ব্যবহার করবে। ভদ্রতা ও রুচিশীলতার জবাব ভদ্রতা ও রুচিশীলতার মাধ্যমে দাও। বরং তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে তোমরা অন্যদের চাইতও বেশী ভদ্রতা ও রুচিশীলতার পরিচয় দেবে। দুনিয়াকে ন্যায় ও সত্যের সরল পথের দিকে আহবান জানানোর দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে যে আহবায়ক দলটির যাত্রা শুরু হয়েছে, তার জন্য প্রতিপক্ষের প্রতি বিকৃত মুখভংগী করা এবং রূঢ় ব্যবহার ও তিক্ত বাক্যবাণে তাদেরকে বিদ্ধ করা শোভা পায় না। এতে নফ্স পরিতৃপ্ত হয় ঠিকই কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তাদের অভিযাত্রা তা পুরোপুরি নিষ্ফল হয়ে যায়।

১১৫. অর্থাৎ কাফের, মুশরিক ও নাস্তিকরা যা কিছু করছে তাতে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে কোন পরিবর্তন সূচিত হয় না। তাঁর এক আল্লাহ এবং নিরংকুশ ও সার্বভৌম ক্ষমতা-সম্পন্ন ইলাহ হওয়া এমন একটি বাস্তব সত্য, যাকে উল্টে দেবার ক্ষমতা কারো নেই। তারপর একদিন তিনি সমগ্র মানব জাতিকে একত্রে সমবেত করে তাদের প্রত্যেককে তার কর্মফল দেখিয়ে দেবেন। তাঁর ক্ষমতার সীমানা পেরিয়ে কেউ পালিয়ে যেতে পারবে না। কাজেই আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহাত্মক আচরণকারীদের বিরুদ্ধে কেউ তাঁর পক্ষ থেকে বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করবে এবং তাদের সাথে অসদাচরণ করে ও তিক্ত বাক্য শেলে তাদেরকে বিদ্ধ করে আহত হৃদয়ে প্রলেপ লাগাবে, আল্লাহর এর কোন প্রয়োজন নেই।

এটা হচ্ছে এই আয়াতটির সাথে ওপরের আয়াতের সম্পর্কের বিষয়। কিন্তু পেছনের দু'-তিন রুকূ' থেকে যে বর্ণনার ধারাবাহিকতা চলে আসছে এই আয়াতটিতে তার বক্তব্যের সমাপ্তি ঘটেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে আয়াতটির অর্থ এই দাঁড়ায়, দুনিয়ার জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তি তার ইচ্ছেমতো পথে চলতে পারে এবং যে পথে ইচ্ছে সে তার প্রচেষ্টা ও কর্মশক্তি নিয়োগ করতে পারে। এ ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সবশেষে একদিন সবাইকে আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে। সেদিন আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভু থাকবে না। সেখানে সবাই নিজের প্রচেষ্টা ও কাজের ফল স্বচক্ষে দেখে নেবে।

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ۚ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللهُ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿٨٨﴾

১২ রুকূ'

*তারপর তোমাদের কী হয়েছে, মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে দ্বিমত পাওয়া যাচ্ছে?*[১১৬] *অথচ যে দুষ্কৃতি তারা উপার্জন করেছে তার বদৌলতে আল্লাহ তাদেরকে উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে।*[১১৭] *তোমরা কি চাও, আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেননি তোমরা তাকে হিদায়াত করবে? অথচ আল্লাহ যাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন তার জন্য তুমি কোন পথ পাবে না।*

১১৬. এখানে এমন সব মুনাফিক মুসলমানদের কথা আলোচনা করা হয়েছে যারা মক্কায় ও আরবের অন্যান্য এলাকায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু হিজরাত করে দারুল ইসলামে না এসে যথারীতি নিজেদের কাফের গোত্রের মধ্যে অবস্থান করছিল। তাদের কাফের গোত্র ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব কাজ করতো তারাও তাদের সাথে কমবেশী সেসব কাজে কার্যত অংশ নিতো। তাদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করা যায়, এ বিষয়টি মুসলমানদের জন্য আসলে অত্যন্ত জটিল ছিল। কেউ কেউ বলছিল, যাই হোক না কেন, তারা তো মুসলমান, কালেমা পড়ে, নামায পড়ে, রোযা রাখে, কুরআন তেলাওয়াত করে। তাদের সাথে কাফেরদের মতো ব্যবহার কেমন করে করা যেতে পারে? এই রুকূ'তে মহান আল্লাহ মুসলমানদের মতবিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিয়েছেন।

এ প্রসংগে একটি কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে। অন্যথায় কুরআনের কেবল এই জায়গায় নয় আরো বিভিন্ন জায়গায়, যেখানে হিজরাত না করার কারণে মুসলমানদেরকে মুনাফিকের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে, সেখানে কুরআন মজীদের আসল বক্তব্য অনুধাবন করা সম্ভব হবে না। আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনা তাইয়েবায় হিজরাত করে আসেন এবং যখন আরব দেশে এমন একটি ছোট্ট ভূখণ্ড পাওয়া গিয়েছিল, যেখানে একজন মু'মিন বান্দার জন্য তার দীন ও ঈমানের দাবী পূরণ করা সম্ভবপর ছিল তখন যেখানে, যে এলাকায় ও যেসব গোত্রের মধ্যে ঈমানদারগণ কাফেরদের অধীনে ইসলামী জীবন যাপনের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ছিল, সেখান থেকে তাদের জন্য হিজরাত করার ও মদীনার দারুল ইসলামে চলে আসার সাধারণ হুকুমনামা জারী করে দেয়া হয়েছিল। সে সময় যাদের হিজরাত করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র এজন্য হিজরাত করছিল না যে, তাদের নিজেদের ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন ও নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থ তাদের কাছে ইসলামের তুলনায় বেশী প্রিয় ছিল, তাদের সবাইকে মুনাফিক গণ্য করা হয়। আর যারা যথার্থই একেবারে অক্ষম ছিল তাদেরকে 'মুসতাদআফীন' (দুর্বল) গণ্য করা হয়। যেমন পরবর্তী ১৪ রুকূ'তে বলা হয়েছে।

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾

*তারা তো এটাই চায়, তারা নিজেরা যেমন কাফের হয়েছে তেমনি তোমরাও কাফের হয়ে যাও, যাতে তারা ও তোমরা সমান হয়ে যাও। কাজেই তাদের মধ্য থেকে কাউকেও নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পথে হিজরাত করে আসে। আর যদি তারা (হিজরাত থেকে) বিরত থাকে, তাহলে তাদেরকে যেখানেই পাও ধরো এবং হত্যা করো[১১৮] এবং তাদের মধ্য থেকে কাউকেও নিজেদের বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না।*

এখন একথা সুস্পষ্ট যে, দারুল কুফরে অবস্থানকারী কোন মুসলমানকে নিছক হিজরাত না করার কারণে মুনাফিক কেবলমাত্র তখনি বলা যেতে পারে যখন দারুল ইসলামের পক্ষ থেকে এ ধরনের মুসলমানদেরকে সেখানে বসবাস করার আহবান জানানো হবে অথবা কমপক্ষে তাদের জন্য দারুল ইসলামের দরজা উন্মুক্ত থাকবে। এ অবস্থায় অবশ্যি যেসব মুসলমান দারুল কুফরকে দারুল ইসলামে পরিণত করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাবে না আবার অন্য দিকে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হিজরাতও করবে না তারা সবাই মুনাফিক বলে গণ্য হবে। কিন্তু দারুল ইসলামের পক্ষ থেকে যদি আমন্ত্রণই না জানানো হয় এবং মুহাজিরদের জন্য তাদের দরজা যদি উন্মুক্তই না থাকে, তাহলে এ অবস্থায় শুধুমাত্র হিজরাত না করলে কোন মুসলমান মুনাফিক হয়ে যাবে না। বরং এ অবস্থায় যখন সে কোন মুনাফিক সুলভ কাজ করবে কেবলমাত্র তখনই মুনাফিক গণ্য হবে।

১১৭. অর্থাৎ যে দ্বিমুখী নীতি, সুবিধাবাদিতা এবং আখেরাতের ওপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেবার কর্মনীতি তারা অবলম্বন করেছে, তার বদৌলতে আল্লাহ তাদেরকে আবার সেদিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন যেদিক থেকে তারা এসেছিল। তারা কুফরী থেকে বের হয়ে ইসলামের দিকে এগিয়ে এসেছিল ঠিকই কিন্তু এই এলাকায় এসে অবস্থান করার এবং একমুখী ও একাগ্র হবার প্রয়োজন ছিল, ঈমান ও ইসলামের স্বার্থের সাথে সংঘর্ষশীল প্রতিটি স্বার্থ পরিহার করার প্রয়োজন ছিল এবং আখেরাতের ওপর এমন দৃঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজন ছিল যার ভিত্তিতে মানুষ নিশ্চিন্তে নিজের দুনিয়ার স্বার্থ পরিহার করতে পারে। কিন্তু তা তারা অর্জন করতে পারেনি। তাই তারা যেদিক থেকে এসেছিল পেছন ফিরে আবার সেদিকেই চলে গেছে। কাজেই এখন তাদের ব্যাপারে মতবিরোধ করার আর কোন অবকাশই নেই।

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ
حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ
وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾
سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ
كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ
وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٩١﴾

*অবশ্যি সেই সব মুনাফিক এই নির্দেশের আওতাভুক্ত নয়, যারা এমন কোন জাতির সাথে মিলিত হয়, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ।[১১৯] এভাবে সেই সব মুনাফিকও এর আওতাভুক্ত নয়, যারা তোমাদের কাছে আসে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে অনুৎসাহিত, না তোমাদের বিরুদ্ধে লড়তে চায়, না নিজেদের জাতির বিরুদ্ধে। আল্লাহ চাইলে তাদেরকে তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিতেন এবং তারাও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। কাজেই তারা যদি তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে আর তোমাদের দিকে সন্ধি ও সখ্যতার হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের ওপর হস্তক্ষেপ করার কোন পথ রাখেননি। তোমরা আর এক ধরনের মুনাফিক পাবে, যারা চায় তোমাদের থেকে নিরাপদ থাকতে এবং নিজেদের জাতি থেকেও। কিন্তু যখনই ফিতনার সুযোগ পাবে তারা তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই ধরনের লোকেরা যদি তোমাদের সাথে মোকাবিলা করা থেকে বিরত না থাকে, তোমাদের কাছে সন্ধি ও শান্তির আবেদন পেশ না করে এবং নিজেদের হাত টেনে না রাখে, তাহলে তাদেরকে যেখানেই পাও ধরো এবং হত্যা করো। তাদের ওপর হাত উঠাবার জন্য আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট অধিকার দান করলাম।*

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

১৩ রুকূ'

*কোন মু'মিনের কাজ নয় অন্য মু'মিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত হতে পারে।[১২০] আর যে ব্যক্তি ভুলবশত কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার কাফ্ফারা হিসেবে একজন মু'মিনকে গোলামী থেকে মুক্ত করে দিতে হবে[১২১] এবং নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদেরকে রক্ত মূল্য দিতে হবে[১২২] তবে যদি তারা রক্ত মূল্য মাফ করে দেয় তাহলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যদি ঐ নিহত মুসলিম ব্যক্তি এমন কোন জাতির অন্তরভুক্ত হয়ে থাকে যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে তাহলে একজন মু'মিন গোলামকে মুক্ত করে দেয়াই হবে তার কাফ্ফারা। আর যদি সে এমন কোন অমুসলিম জাতির অন্তরভুক্ত হয়ে থাকে যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে তাহলে তার ওয়ারিসদেরকে রক্ত মূল্য দিতে হবে এবং একজন মু'মিন গোলামকে মুক্ত করে দিতে হবে।[১২৩] আর যে ব্যক্তি কোন গোলাম পাবে না তাকে পরপর দু' মাস রোযা রাখতে হবে।[১২৪] এটিই হচ্ছে এই গোনাহের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে তাওবা করার পদ্ধতি।[১২৫] আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানময়।*

১১৮. মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফের জাতিদের সাথে যেসব মুনাফিক মুসলমান সম্পর্ক রাখে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ও শত্রুতামূলক কার্যকলাপে কার্যত অংশগ্রহণ করে, তাদের সম্পর্কে এই নির্দেশটি দেয়া হয়েছে।

১১৯. এখানে আওতাভুক্ত না করার যে নির্দেশটি জারী করা হয়েছে তার সম্পর্ক "তাদের মধ্য থেকে কাউকে নিজেদের বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না" বাক্যটির সাথে নয়। বরং এর সম্পর্ক হচ্ছে "তাদেরকে যেখানেই পাও ধরো এবং হত্যা করো" বাক্যটির সাথে। এর অর্থ হচ্ছে, যেসব মুনাফিককে হত্যা করা ওয়াজিব, তারা যদি এমন কোন জাতির এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নেয় যাদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের চুক্তি

রয়েছে, তাহলে সেই রাষ্ট্রের সীমানায় প্রবেশ করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা যাবে না। আর দারুল ইসলামের কোন মুসলমান কোন নিরপেক্ষ দেশের এলাকায় যদি এমন কোন মুনাফিককে পায় যাকে হত্যা করা ওয়াজিব এবং তাকে হত্যাও করে ফেলে, তাহলে এটাও কোনক্রমে বৈধ হবে না। এখানে আসলে মুনাফিকের রক্তের প্রতি নয় বরং চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনই লক্ষ।

১২০. ওপরে যেসব মনাফিক মুসলমানদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এখানে তাদের কথা বলা হয়নি। বরং এখানে এমন মুসলমানদের কথা বলা হয়েছে যারা দারুল ইসলামের অধিবাসী অথবা দারুল হারব বা দারুল কুফরে অবস্থান করলেও ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের তৎপরতায় তাদের অংশগ্রহণের কোন প্রমাণ নেই। সে সময় এমন বহু লোকও ছিল যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজেদের যথার্থ অক্ষমতার কারণে ইসলামের শত্রু গোত্রদের মধ্যে অবস্থান করছিল। অনেক সময় এমন দুর্ঘটনা ঘটে যেতো, মুসলমানরা কোন ইসলাম দুশমন গোত্রের ওপর আক্রমণ চালাতো এবং সেখানে তাদের অজ্ঞতাবশত তাদের হাতে কোন মুসলমান মারা যেতো। তাই মহান আল্লাহ এখানে ভুলবশত মুসলমানের হাতে কোন মুসলমানের নিহত হবার বিষয় সম্পর্কিত বিধান বর্ণনা করেছেন।

১২১. যেহেতু নিহত ব্যক্তি একজন মু'মিন, তাই একজন মু'মিন গোলামকে মুক্ত করে দেয়াই তাকে হত্যা করার কাফ্‌ফারা গণ্য করা হয়েছে।

১২২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রক্ত বিনিময়ের পরিমাণ এক শত উট, দুই শত গরু বা দুই হাজার ছাগল নির্ধারণ করেছেন। কোন ব্যক্তি যদি রক্তমূল্য হিসেবে অন্য কিছু দিতে চায় তাহলে এই জিনিসগুলোর বিক্রয়মূল্য ধরে তার পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে নগদ মুদ্রায় রক্তমূল্য দানকারীদের জন্য ৮ শত দীনার বা ৮ হাজার দিরহাম নির্ধারিত ছিল। হযরত উমর (রা) তাঁর শাসনামলে বলেন ঃ উটের দাম এখন বেড়ে গেছে। কাজেই এখন স্বর্ণমুদ্রায় এক হাজার দীনার বা রৌপ্যমুদ্রায় ১২ হাজার দিরহাম রক্ত মূল্য হিসেবে আদায় করতে হবে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, রক্তমূল্যের এ পরিমাণটি জেনে বুঝে হত্যা করার জন্য নয় বরং ভুলবশত হত্যা করার জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

১২৩. এই আয়াতটির বিধানসমূহের সংক্ষিপ্তসার নীচে দেয়া হলো ঃ

এক ঃ নিহত ব্যক্তি যদি দারুল ইসলামের অধিবাসী হয় তাহলে তার হত্যাকারীকে রক্তমূল্য দিতে হবে এবং আল্লাহর কাছে নিজের গোনাহমাফীর জন্য একজন গোলামকেও মুক্ত করে দিতে হবে।

দুই ঃ যদি নিহত ব্যক্তি দারুল হারবের বাসিন্দা হয় তাহলে হত্যাকারী কেবলমাত্র গোলাম মুক্ত করে দেবে। তাকে কোন রক্তমূল্য দিতে হবে না।

তিন ঃ যদি নিহত ব্যক্তি এমন কোন দারুল কুফরের বাসিন্দা হয় যার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের চুক্তি রয়েছে, তাহলে হত্যাকারী একজন গোলামকে মুক্ত করে দেবে এবং এ ছাড়াও রক্তমূল্যও দান করেবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রক্তমূল্যের পরিমাণ তাই হবে, যা সে চুক্তিবদ্ধ জাতির একজন অমুসলিম অধিবাসীকে হত্যা করলে চুক্তি অনুযায়ী দিতে হয়।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿٩٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ؕ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٩٤﴾

*আর যে ব্যক্তি জেনে বুঝে কোন মু'মিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার ওপর আল্লাহর গযব ও তাঁর লানত এবং আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।*

*হে ঈমানদারগণ। যখন তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য বের হও তখন বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে পার্থক্য করো এবং যে ব্যক্তি সালামের মাধ্যমে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসে তাকে সংগে সংগেই বলে দিয়ো না যে, তুমি মু'মিন নও।[১২৬] যদি তোমরা বৈষয়িক স্বার্থলাভ করতে চাও তাহলে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য অনেক গণীমাতের মাল রয়েছে। ইতিপূর্বে তোমরা নিজেরাও তো একই অবস্থায় ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।[১২৭] কাজেই তোমরা অনুসন্ধান করে পদক্ষেপ গ্রহণ করো। তোমরা যা কিছু করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত।*

১২৪. অর্থাৎ একাদিক্রমে রোযা রাখতে হবে। মাঝখানে ফাঁক যাবে না। যদি কোন ব্যক্তি শরঈ ওযর ছাড়াই মাঝখানে একটি রোযাও ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে আবার নতুন করে রোযা শুরু করতে হবে।

১২৫. অর্থাৎ এটা 'জরিমানা' নয় বরং 'তাওবা' ও 'কাফ্‌ফারা'। জরিমানার লজ্জা, অনুতাপ ও আত্মসংশোধনের কোন অন্তরনিহিত প্রাণশক্তি কার্যকর থাকে না। বরং সাধারণত অত্যন্ত বিরক্তিসহকারে বাধ্য হয়েই জরিমানা আদায় করতে হয় এবং এরপরও ধূমায়িত অসন্তোষ ও তিক্ততার মনোভাব থেকেই যায়। বিপরীত পক্ষে মহান আল্লাহ চান, বান্দা এবাদাত-বন্দেগী, সৎকাজ ও অধিকার আদায় করার মাধ্যমে নিজের মন-মানসের ওপর থেকে নিজের ভুলের প্রভাব ধুয়ে মুছে ফেলবে এবং লজ্জা ও অনুতাপ সহকারে

আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে। এভাবে সে কেবল এই গোনাহের ক্ষমা লাভ করবে না বরং এই সংগে ভবিষ্যতের জন্য সে এই ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি করা থেকেও নিজেকে সংরক্ষিত রাখতে পারবে। 'কাফ্ফারার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, "গোপনকারী বস্তু।" কোন সৎকাজকে গোনাহের কাফ্ফারা গণ্য করার অর্থ হচ্ছে এই যে, এই নেকীটি ঐ গোনাহের ওপর ছেয়ে যায় এবং তাকে ঢেকে ফেলে। যেমন কোন দেয়ালের গায়ে দাগ লেগে গেলে চুনকাম করে দাগ মিটিয়ে দেয়া হয়।

১২৬. ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে 'আস্সালামু আলাইকুম' বাক্যটি মুসলমানদের জন্য ঐতিহ্য ও পরিচিতির প্রকাশ ছিল। একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে দেখলে এ বাক্যটি ব্যবহার করতো এই অর্থে, "আমিও তোমার দলভুক্ত, তোমার বন্ধু ও শুভাকাংখী। আমার কাছে তোমার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা ছাড়া আর কিছুই নেই। কাজেই তুমি আমার সাথে শত্রুতা করো না এবং আমার পক্ষ থেকেও তোমার জন্য শত্রুতা ও ক্ষতির কোন আশংকাই নেই।" সেনাবাহিনীর মধ্যে যেমন সাংকেতিক শব্দ (Password) হিসেবে একটি শব্দ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় এবং রাতে এক সেনাবাহিনীর লোক অন্য সেনাবাহিনীর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় এই শব্দ ব্যবহার করে যাতে সে শত্রু সেনাবাহিনীর লোক নয় একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়, ঠিক তেমনি সালাম শব্দটিকেও মুসলমানদের মধ্যে সাংকেতিক শব্দ হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। বিশেষ করে সেই সময় এই সাংকেতিক শব্দটি ব্যবহারের গুরুত্ব আরো বেশী ছিল এজন্য যে, সে সময় আরবের নওমুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে পোশাক, ভাষা বা অন্য কোন জিনিসের ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল না। ফলে একজন মুসলমানের পক্ষে প্রথম দৃষ্টিতে অন্য একজন মুসলমানকে চিনে নেয়া খুব কঠিন ছিল।

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াতো আরো জটিল। মুসলমানরা যখন কোন শত্রুদলের ওপর আক্রমণ করতো এবং সেখানের কোন মুসলমান তাদের তরবারির নীচে এসে যেতো তখন আক্রমণকারী মুসলমানদেরকে সে জানাতে চাইতো, আমি তোমাদের দীনী ভাই। একথা জানাবার জন্য সে 'আস্সালামু আলাইকুম' বা 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে চীৎকার করে উঠতো । কিন্তু মুসলমানরা তাতে সন্দেহ করতো। তারা মনে করতো, এ ব্যক্তি কোন কাফের, নিছক নিজের জান বাঁচাবার জন্য সে এই কৌশল অবলম্বন করেছে। এজন্য অনেক সময় তারা এ ধরনের লোককে হত্যা করে বসতো এবং তার মালমাত্তা গণীমাত হিসেবে লুট করে নিতো। নবী সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ধরনের ব্যাপারে প্রতি ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোরভাবে তিরস্কার ও শাসন করেছেন। কিন্তু তবুও এ ধরনের দুর্ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ কুরআন মজীদে এই সমস্যার সমাধান পেশ করেছেন।

এখানে এই আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান হিসেবে পেশ করছে তার ব্যাপারে তোমাদের এ ধরনের হালকাভাবে ফায়সালা করার কোন অধিকার নেই যে, সে নিছক প্রাণ বাঁচাবার জন্য মিথ্যা বলছে। সে সত্যবাদীও হতে পারে, মিথ্যাবাদীও হতে পারে। প্রকৃত সত্য তো জানা যাবে অনুসন্ধানের পর। অনুসন্ধান ছাড়াই তাকে ছেড়ে দেবার ফলে যদি একজন কাফেরের মিথ্যা বলে প্রাণ বাঁচাবার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তাকে হত্যা করার পরে তোমাদের হাতে একজন নিরপরাধ মু'মিনের মারা পড়ারও সম্ভাবনা

لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَ
الْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ
الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا
وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ
اَجْرًا عَظِيْمًا ۙ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ۟

*যেসব মুসলমান কোন প্রকার অক্ষমতা ছাড়াই ঘরে বসে থাকে আর যারা ধন–প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তাদের উভয়ের মর্যাদা সমান নয়। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের তুলনায় জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ বুলন্দ করেছেন। যদিও সবার জন্য আল্লাহ কল্যাণ ও নেকীর ওয়াদা করেছেন তবুও তাঁর কাছে মুজাহিদদের কাজের বিনিময় বসে থাকা লোকদের তুলনায় অনেক বেশী।[১২৮] তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে বিরাট মর্যাদা, মাগফেরাত ও রহমত। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।*

থাকে। কাজেই ভুলবশত একজন কাফেরকে ছেড়ে দেয়া ভুলবশত একজন মু'মিনকে হত্যা করার চেয়ে অনেক ভালো।

১২৭. অর্থাৎ তোমাদেরও এমন এক সময় ছিল যখন তোমরা কাফের গোত্রগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলে। জুলুম নির্যাতনের ভয়ে ইসলামের কথা বাধ্য হয়ে গোপন রাখতে। ঈমানের মৌখিক অংগীকার ছাড়া তোমাদের কাছে তার আর কোন প্রমাণ ছিল না। এখন আল্লাহর অনুগ্রহে তোমরা সামাজিক জীবন যাপনের সুবিধে ভোগ করছো। তোমরা এখন কাফেরদের মোকাবিলায় ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার যোগ্যতা লাভ করেছো। কাজেই যেসব মুসলমান এখনো প্রথম অবস্থায় আছে তাদের ব্যাপারে কোমল ব্যবহার ও সুবিধাদানের নীতি অবলম্বন না করলে তোমাদেরকে যে অনুগ্রহ করা হয়েছে তার প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে না।

১২৮. জিহাদের নির্দেশ জারী করার পর যারা টালবাহানা করে বসে থাকে অথবা জিহাদের জন্য সাধারণভাবে ঘোষণা দেবার এবং জিহাদ করা 'ফরযে আইন' হয়ে যাবার পরও যারা লড়াই করতে গড়িমসি করে তাদের কথা এখানে বলা হয়নি। বরং এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা জিহাদ করা যখন 'ফরযে কিফায়া' সে অবস্থায় যুদ্ধের

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَّلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

১৪ রুকূ'

*যারা নিজেদের ওপর জুলুম করছিল[১২৯] ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় জিজ্ঞেস করলো : তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা জবাব দিল, আমরা পৃথিবীতে ছিলাম দুর্বল ও অক্ষম। ফেরেশতারা বললো : আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না? তোমরা কি সেখানে হিজরাত করে অন্যস্থানে যেতে পারতে না?[১৩০] জাহান্নাম এসব লোকের আবাস স্থিরীকৃত হয়েছে এবং আবাস হিসেবে তা বড়ই খারাপ জায়গা। তবে যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু যথার্থই অসহায় এবং তারা বের হবার কোন পথ–উপায় খুঁজে পায় না, আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেবেন এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।*

ময়দানে যাবার পরিবর্তে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকে। প্রথম দু'টি অবস্থায় জিহাদের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের ময়দানে যেতে বিরত থাকলে একজন মুসলমান কেবল মুনাফিকই হতে পারে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য কল্যাণ ও নেকীর কোন ওয়াদা নেই। তবে যদি সে কোন যথার্থ অক্ষমতার শিকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা । বিপরীত পক্ষে শেষোক্ত অবস্থায় ইসলামী জামায়াতের সমগ্র সমরশক্তির প্রয়োজন হয় না । বরং তার একটি অংশের প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় যদি ইমামের পক্ষ থেকে এই মর্মে ঘোষণা দেয়া হয় যে, উমুক অভিযানে যারা অংশ গ্রহণ করতে চায় তারা যেন নিজেদের নাম পেশ করে দেয়—ইমামের এই আহবানে যারা সাড়া দেবে তারা অন্যান্য কল্যাণকর কাজে যারা ব্যস্ত থাকবে তাদের তুলনায় অবশ্যি উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে।

১২৯. এখানে এমন লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা ইসলাম গ্রহণ করার পরও কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা ও অক্ষমতা ছাড়াই এখনো পর্যন্ত নিজেদের কাফের গোত্রের সাথে অবস্থান করছিল। তারা আধা মুসলমানের ও আধা কাফেরের জীবন যাপন করেই

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾

*যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরাত করবে, সে পৃথিবীতে আশ্রয়লাভের জন্য অনেক জায়গা এবং সময় অতিবাহিত করার জন্য বিরাট অবকাশ পাবে। আর যে ব্যক্তি নিজের গৃহ থেকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে হিজরাত করার জন্য বের হবে তারপর পথেই তার মৃত্যু হবে, তার প্রতিদান দেয়া আল্লাহর জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।*[১৩১]

সন্তুষ্ট ছিল। অথচ ইতিমধ্যে একটি দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে হিজরাত করে নিজেদের দীন ও আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী ইসলামী জীবন যাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল। এটিই ছিল নিজেদের ওপর তাদের জুলুম। কেননা পূর্ণাংগ ইসলামী জীবন যাপনের মোকাবিলায় এই আধা কুফরী ও আধা ইসলামী জীবনে যে জিনিসটি তাদেরকে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত করে তুলেছিল সেটি যথার্থই কোন অক্ষমতা ছিল না। বরং সেটি ছিল নিছক আত্মবিলাসিতা এবং নিজেদের পরিবার, সহায়-সম্পত্তি, অর্থ-সম্পদ ও পার্থিব স্বার্থপ্রীতি। নিজেদের দীনের ওপর তারা এগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য ১১৬ টীকা দেখুন।)

১৩০. অর্থাৎ যদি কোন স্থানে আল্লাহদ্রোহীদের প্রতিপত্তি থেকে থাকে এবং সেখানে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াতের বিধান কার্যকর করা সম্ভবপর না হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে অবস্থান করতেই হবে এমন কি বাধ্যবাধকতা ছিল? সেই স্থান ত্যাগ করে তারা এমন কোন ভূখণ্ডে স্থানান্তরিত হলো না কেন যেখানে গিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত আইন মেনে চলা সম্ভবপর হতো?

১৩১. এখানে একথা বুঝতে হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনের ওপর ঈমান এনেছে তার জন্য কুফরী জীবন ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করা কেবল মাত্র দু'টি অবস্থায় বৈধ হতে পারে। এক, সে ইসলামকে সে দেশে বিজয়ী করার ও কুফরী জীবন ব্যবস্থাকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকবে যেমন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও তাঁর প্রাথমিক অনুসারী বৃন্দ চালিয়ে এসেছেন। দুই, সে আসলে সেখান থেকে বের হয়ে আসার কোন পথ পায়নি, তাই চরম ঘৃণা, অনিচ্ছা ও অসন্তুষ্টি সহকারে বাধ্য হয়ে সেখানে অবস্থান করবে। এই দু'টি অবস্থা ছাড়া অন্য যে কোন অবস্থায় দারুল কুফরে অবস্থান করা একটি স্থায়ী গোনাহের শামিল। আর এই গোনাহের সপক্ষে এই ধরনের কোন ওজর পেশ করা যে, এই দুনিয়ায় আমরা হিজরাত করে গিয়ে অবস্থান করতে পারি এমন কোন দারুল ইসলাম পাইনি আসলে মোটেই কোন গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ওজর বলে বিবেচিত হবে না। যদি কোন দারুল ইসলাম না থেকে থাকে

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

১৫ রুকূ'

*আর যখন তোমরা সফরে বের হও তখন নামায সংক্ষেপ করে নিলে কোন ক্ষতি নেই।[১৩২] (বিশেষ করে) যখন তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফেররা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে।[১৩৩] কারণ তারা প্রকাশ্যে তোমাদের শত্রুতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।*

তাহলে কি আল্লাহর এই ব্যাপক বিস্তৃত পৃথিবীতে এমন কোন পাহাড় বা বন জংগলও ছিল না যেখানে আশ্রয় নিয়ে মানুষ গাছের পাতা খেয়ে ও ছাগলের দুধপান করে জীবনধারণ করতে পারতো এবং কুফরী জীবনবিধানের আনুগত্য থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হতো?

"লা হিজরাতা বা'দাল ফাত্হে"—মক্কা বিজয়ের পর এখন আর কোন হিজরাত নেই—এ হাদীসটি থেকে অনেকে ভুল ধারণা নিয়েছেন। অথচ এ হাদীসটি কোন চিরন্তন হুকুম নয়। বরং সে সময়ের অবস্থা ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আরবদেরকে একথা বলা হয়েছিল। যতদিন আরবের অধিকাংশ এলাকা দারুল হারব ও দারুল কুফরের অন্তরভুক্ত ছিল এবং কেবলমাত্র মদীনায় ও মদীনার আশেপাশে ইসলামের বিধান জারী হচ্ছিল, ততদিন মুসলমানদের বাধ্যতামূলকভাবে হুকুম দেয়া হয়েছিল যে, চর্তুদিক থেকে এসে তাদের দারুল ইসলামে একত্র হতে হবে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর আরবে যখন কুফরী শক্তি ভেঙে পড়লো এবং প্রায় সমগ্র দেশ ইসলামী ঝাণ্ডার অধীন হলো, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এখন আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। তার এ বক্তব্যের অর্থ এ নয় যে, সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য সর্ব অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত হিজরাত ফরয হবার বিধান বাতিল হয়ে গেছে।

১৩২. যেসব ওয়াক্তে চার রাকআত নামায ফরয সেসব ওয়াক্তে ফরয নামায দুই রাকআত পড়াই হচ্ছে শান্তির সময়ের সফরের কসর। আর যুদ্ধের সময়ে কসর করার ব্যাপারে কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। যুদ্ধের অবস্থায় যেভাবে সম্ভব নামায পড়ে নিতে হবে। জামায়াতে পড়ার সুযোগ থাকলে জামায়াতে পড়ে নিতে হবে। অন্যথায় ব্যক্তিগতভাবে একা একা পড়ে নিতে হবে। কিবলার দিকে মুখ করে পড়া সম্ভব না হলে যে দিকে মুখ করে পড়া সম্ভব সেদিকে মুখ করে পড়তে হবে। সাওয়ারীর পিঠে বসে চলন্ত অবস্থায়ও পড়া যেতে পারে। রুকূ' ও সিজদা করা সম্ভব না হলে ইশারায় পড়তে হবে। প্রয়োজন হলে নামায পড়া অবস্থায় হাঁটতেও পারে। কাপড়ে রক্ত লেগে থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। এতো সব সহজ ব্যবস্থার পরও যদি অবস্থা এতই বিপজ্জনক হয়, যার ফলে নামায পড়া

সম্ভবপর না হয়ে থাকে, তাহলে বাধ্য হয়ে নামায পিছিয়ে দিতে হবে। যেমন খন্দকের যুদ্ধের সময় হয়েছিল।

সফরে কি কেবল ফরয পড়া হবে, না সুন্নাতও পড়া হবে—এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা কিছু প্রমাণিত তা হচ্ছে এই যে, তিনি সফরে ফজরের সুন্নাত ও এশার বেতের নিয়মিত পড়তেন কিন্তু অন্যান্য ওয়াক্তে কেবল ফরয পড়তেন। নিয়মিত সুন্নাত পড়া তাঁর থেকে প্রমাণিত হয়নি। তবে নফল নামাযের যখনই সুযোগ পেতেন পড়ে নিতেন। এমনকি সাওয়ারীর পিঠে বসেও নফল নামায পড়তেন। এজন্যই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) লোকদের সফরে ফজর ছাড়া অন্য ওয়াক্তে সুন্নাতগুলো পড়তে মানা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ উলামা সুন্নাত ও নফল পড়া বা না পড়া উভয়টি জায়েয গণ্য করেছেন এবং ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর তা ছেড়ে দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবের সর্বজন গৃহীত মতটি হচ্ছে, মুসাফির যখন পথে চলমান অবস্থায় থাকে তখন তার সুন্নাত না পড়াই উত্তম আর যখন কোন স্থানে অবস্থান করতে থাকে এবং সেখানে নিশ্চিন্ত পরিবেশ বিরাজ করে, সে ক্ষেত্রে সুন্নাত পড়াই উত্তম।

যে সফরে কসর করা যেতে পারে সে সম্পর্কে কোন কোন ইমাম শর্ত আরোপ করেছেন যে, তা হতে হবে ফী সাবীলিল্লাহ—আল্লাহর পথে। যেমন জিহাদ, হজ্জ, উমরাহ, ইসলামী জ্ঞান আহরণ ইত্যাদি। ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ ও আতা এরি ওপর ফতোয়া দিয়েছেন। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ বলেন, সফর এমন কোন উদ্দেশ্যে হতে হবে যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে জায়েয। হারাম ও নাজায়েয উদ্দেশ্য সামনে রেখে যে সফর করা হয় তাতে কসরের অনুমতির সুবিধা ভোগ করার অধিকার কারোর নেই। হানাফীদের মতে, যে কোন সফরে কসর করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সফরের ধরন সম্পর্কে বলা যায়, তা নিজেই সওয়াব বা আযাবের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু কসরের অনুমতির ওপর তার কোন প্রভাব পড়ে না।

কোন কোন ইমাম "কোন ক্ষতি নেই" (فليس عليكم جناح) বাক্যটি থেকে এ অর্থ নিয়েছেন যে, সফরে কসর করা জরুরী নয়। বরং সফরে কসরের নিছক অনুমতিই দেয়া হয়েছে। ব্যক্তি চাইলে এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে আবার চাইলে পুরো নামায পড়তে পারে। ইমাম শাফেঈ এ মতটি গ্রহণ করেছেন, যদিও তিনি কসর করাকে উত্তম এবং কসর না করাকে উত্তম কাজ ত্যাগ করার অন্তরভুক্ত করেছেন। ইমাম আহমাদের মতে কসর করা ওয়াজিব না হলেও কসর না করা মাকরূহ। ইমাম আবু হানীফার মতে কসর করা ওয়াজিব। একটি বর্ণনা মতে ইমাম মালিকেরও এই একই মত উদ্ধৃত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামেশা সফরে কসর করেছেন, এটা হাদীস থেকে প্রমাণিত। কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত থেকে একথা প্রমাণিত হয়নি যে, তিনি সফরে কখনো চার রাকাআত ফরয পড়েছেন। ইবনে উমর বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর, উমর, ওসমান রাদিআল্লাহু আনহুমের সাথে সফর করেছি। আমি কখনো তাদের সফরে কসর না করতে দেখিনি। এরি সমর্থনে ইবনে আব্বাস এবং আরো অসংখ্য সাহাবীর নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত উসমান যখন হজ্জের সময় মীনায় চার রাকাআত পড়ালেন তখন সাহাবীগণ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। হযরত উসমান তখন এই জবাব দিয়ে লোকদের নিশ্চিন্ত করলেন ঃ আমি মক্কায় বিয়ে করেছি

আর যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন শহরে পারিবারিক জীবন শুরু করে সে যেন সেই শহরের অধিবাসী। তাই আমি এখানে কসর করিনি। এই রেওয়ায়াতগুলোর বিরুদ্ধে হযরত আয়েশা থেকে এমন দু'টি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে যা থেকে জানা যায় যে, কসর করা বা পূর্ণ নামায পড়া উভয়টিই ঠিক। কিন্তু এই রেওয়ায়াতগুলো সনদের দিক দিয়ে দুর্বল হবার সাথে সাথে হযরত আয়েশার (রা) নিজের থেকে প্রমাণিত মতেরও বিরোধী। তবে একথা সত্য যে, সফর ও অ-সফরের মাঝামাঝি একটি অবস্থা রয়েছে। সে অবস্থায় একই অস্থায়ী নিবাসে সুবিধা মতো কখনো কসর করা যেতে পারে আবার কখনো পুরো নামায পড়ে নেয়া যেতে পারে। সম্ভবত হযরত আয়েশা (রা) এই অবস্থাটি সম্পর্কে বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে কসর করেছেন আবার পুরো নামাযও পড়েছেন। আর কুরআনের এই "সফরে কসর করলে ক্ষতি নেই" বাক্যটি এ ক্ষেত্রে কোন নতুন কথা নয়। ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ১৯ রুকূ'তেও সাফা ও মারাওয়া পাহাড় দু'টির মাঝখানে 'সাঈ' করার নির্দেশও এই একই ভাষায় দেয়া হয়েছে অথচ এই 'সাঈ' 'মানাসিকে হজ্জ' অর্থাৎ হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর অন্তরভুক্ত এবং ওয়াজিব। আসলে এই উভয় স্থানেই লোকদের মনের একটা আশংকা দূর করাই ছিল এর মূল লক্ষ। সে আশংকাটি ছিল এই যে, এ ধরনের কাজে কোন গোনাহ হবে নাতো বা এতে সওয়াবে কোন কমতি দেখা দেবে না তো! এ ধরনের আশংকা দূর করার উদ্দেশ্যেই এ স্থানে এ বর্ণনাভংগী গ্রহণ করা হয়েছে।

কি পরিমাণ দূরত্বের সফর হলে তাতে কসর করা যেতে পারে? এ ব্যাপারে 'যাহেরী ফিকাহ'-এর মত হচ্ছে, এর কোন পরিমাণ নেই। কম বা বেশী যে কোন দূরত্বের সফর হোক না কেন তাতে কসর করা যেতে পারে। ইমাম মালিকের মতে ৪৮ মাইল বা এক দিন রাতের কম সময়ের সফরে কসর নেই। ইমাম আহমাদও এই একই মত পোষণ করেন। ইবনে আব্বাসও (রা) এই মত পোষণ করতেন। ইমাম শাফেঈর একটি বিবৃতিতে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আনাস (রা) ১৫ মাইলের সফরে কসর জায়েয মনে করেন। "একদিনের সফর কসর করার জন্য যথেষ্ট" হযরত উমরের (রা) এই মত ইমাম আওযায়ী ও ইমাম যুহ্রী গ্রহণ করেছেন। হাসান বসরী দুই দিন এবং ইমাম আবু ইউসুফ দুই দিনের বেশী দূরত্বের সফরে কসর জায়েয মনে করেন। ইমাম আবু হানীফার মতে পায়ে হেঁটে বা উটের পিঠে চড়ে তিন দিন সফর করে যে দূরত্ব অতিক্রম করা যায় (অর্থাৎ প্রায় ১৮ ফরসঙ্গ বা ৫৪ মাইল) তাতে কসর করা যেতে পারে। ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ ও হযরত উসমান রাদি আল্লাহু আনহুমও এই মত পোষণ করেন।

সফরের মাঝখানে কোথাও অবস্থান করলে কতদিন পর্যন্ত কসর করা যেতে পারে—এ ব্যাপারেও ইমামগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ইমাম আহমাদের মতে যেখানে ৪দিন অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে সেখানে পুরা নামায পড়তে হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম সাফেঈর মতে যেখানে ৪দিনের বেশী সময় অবস্থানের নিয়ত থাকে সেখানে কসর করা জায়েয নয়। ইমাম আওযায়ী ১৩ দিনের ও ইমাম আবু হানীফা ১৫ দিনের অথবা তার চেয়ে বেশী দিন অবস্থান করার নিয়ত করলে পুরা নামায পড়ার হুকুম দিয়েছেন। এ অধ্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন সুস্পষ্ট বিধান বর্ণিত হয়নি। আর যদি কোন স্থানে এক ব্যক্তি বাধ্য হয়ে আটকে পড়ে এবং সবসময় তার খেয়াল থাকে

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ
وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ
بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ
وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

*আর হে নবী! যখন তুমি মুসলমানদের মধ্যে থাকো এবং (যুদ্ধাবস্থায়) তাদেরকে নামায পড়াবার জন্য দাঁড়াও[১৩৪] তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দলের তোমার সাথে দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত[১৩৫] এবং তারা অস্ত্রশস্ত্র সংগে নেবে। তারপর তারা সিজদা করে নিলে পেছনে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দলটি, যারা এখনো নামায পড়েনি, তারা এসে তোমার সাথে নামায পড়বে। আর তারাও সতর্ক থাকবে এবং নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র বহন করবে।[১৩৬] কারণ কাফেররা সুযোগের অপেক্ষায় আছে, তোমরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিস পত্রের দিক থেকে সামান্য গাফেল হলেই তারা তোমাদের ওপর অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে। তবে যদি তোমরা বৃষ্টির কারণে কষ্ট অনুভব করো অথবা অসুস্থ থাকো, তাহলে অস্ত্র রেখে দিলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু তবুও সতর্ক থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাকর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।[১৩৭]*

যে, বাধা দূর হলেই সে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হবে, তাহলে এমন স্থানে সে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কসর করতে থাকবে। এ ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত। সাহাবায়ে কেরামদের থেকে এমন অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা থেকে জানা যায়, তাঁরা এ ধরনের অবস্থায় দুই দুই বছর পর্যন্ত অনবরত কসর করেছেন। এরি ওপর কিয়াস করে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল কয়েদীকেও তার সমগ্র মেয়াদ ব্যাপী কসর করার অনুমতি দিয়েছেন।

১৩৩. 'যাহেরী' ও 'খারেজী' ফিকাহর অনুসারীরা এ বাক্যের যে অর্থ গ্রহণ করে থাকে তা হচ্ছে, কসর কেবল যুদ্ধাবস্থার জন্য আর শান্তির অবস্থায় যে সফর করা হয়

তাতে কসর করা কুরআন বিরোধী। কিন্তু নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতের মাধ্যমে হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা) এই একই সন্দেহটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করলে তিনি এর জবাবে বলেন ঃ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ অর্থাৎ "এই নামাযে কসর করার অনুমতিটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পুরস্কার। আল্লাহ তোমাদের এ পুরস্কার দান করেছেন। কাজেই তোমরা এ পুরস্কারটি গ্রহণ করো।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্তি ও ভয় উভয় অবস্থায়ই সফরের নামাযে কসর করেছেন। একথা প্রায় 'মুতাওয়াতির' বা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত সত্য। ইবনে আব্বাস (রা) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلَى مَكَّةَ لاَ يَخَافُ اِلاَّ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ -

অর্থাৎ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা থেকে মক্কার দিকে বের হলেন। সে সময় একমাত্র রব্বুল আলামীন ছাড়া আর কারোর ভয় ছিল না। কিন্তু তিনি নামায দুই রাকআত পড়লে ন।" এজন্য আমি তরজমায় বন্ধনীর মধ্যে "বিশেষ করে" শব্দটি বাড়িয়ে দিয়েছি।

১৩৪. ইমাম আবু ইউসুফ ও হাসান বিন যিয়াদ এই শব্দাবলী থেকে এ ধারণা নিয়েছেন যে, সালাতে খওফ (ভয়ের নামায) কেবলমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে একটি হুকুম দেয়া হয়েছে আবার সেই হুকুমটিই তাঁর পরে তার স্থলাভিষিক্তদের জন্যও আগের মতই কার্যকর রয়েছে, কুরআন মজীদে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কাজেই 'সালাতে খওফ'কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নির্দিষ্ট করার কোন কারণ নেই। এছাড়াও অসংখ্য নেতৃস্থানীয় সাহাবী থেকেও একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরেও 'সালাতে খওফ' পড়েছেন। এ প্রশ্নে কোন সাহাবীর মতবিরোধের উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

১৩৫. শত্রুর আক্রমণের ভয় আছে কিন্তু কার্যত লড়াই হচ্ছে না, এমন অবস্থায় 'সালাতে খওফে'র (ভয়ের নামায) হুকুম দেয়া হয়েছে। আর কার্যত যখন লড়াই চলছে তেমন অবস্থায় হানাফীদের মতে নামায পিছিয়ে দেয়া হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম সুফিয়ান সওরীর মতে রুকূ' ও সিজদা করা সম্ভব না হলে ইশারায় নামায পড়ে নিতে হবে। ইমাম শাফেঈর মতে, নামাযের মধ্যেও কিছুটা যুদ্ধ করা যেতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি খন্দকের যুদ্ধের সময় চার ওয়াক্তের নামায পড়েননি। তারপর সুযোগ পেয়েই তরতীব অনুযায়ী চার ওয়াক্তের নামায এক সাথে পড়ে নেন। অথচ খন্দকের যুদ্ধের আগেই 'সালাতে খওফে'র হুকুম এসে গিয়েছিল।

১৩৬. অনেকটা যুদ্ধের অবস্থার ওপর 'সালাতে খওফ' পড়ার পদ্ধতি নির্ভর করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ নামায পড়িয়েছেন। কাজেই যুদ্ধের অবস্থা বা পরিস্থিতি ঐ পদ্ধতিগুলোর মধ্য থেকে যেটির অনুমতি দেবে তৎকালীন ইসলামী দলের প্রধান সেই পদ্ধতিতেই নামায পড়াবেন।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوٰةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾

*তারপর তোমরা নামায শেষ করার পর দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। আর মানসিক প্রশান্তি লাভ করার পর পুরো নামায পড়ে নাও। আসলে নামায নির্ধারিত সময়ে পড়ার জন্য মু'মিনদের ওপর ফরয করা হয়েছে।*

*এই দলের[১৩৮] পশ্চাদ্ধাবনে তোমরা দুর্বলতা প্রদর্শন করো না। যদি তোমরা যন্ত্রণা ভোগ করে থাকো তাহলে তোমাদের মতো তারাও যন্ত্রণা ভোগ করছে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে এমন জিনিস আশা করো, যা তারা আশা করে না।[১৩৯] আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।*

এর একটি পদ্ধতি হচ্ছে ঃ সেনাদলের একটি অংশ ইমামের সাথে নামায পড়বে এবং অন্য অংশটি তখন দুশমনের মোকাবিলা করতে থাকবে। যখন এক রাকআত পুরা হয়ে যাবে তখন প্রথম অংশটি সালাম ফিরে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় অংশটি এসে ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকআতটি পুরা করবে। এভাবে ইমামের দু'রাকআত এবং সৈন্যদের এক রাকআত নামায হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে ঃ সেনাদলের এক অংশ ইমামের সাথে এক রাকআত পড়ে চলে যাবে তারপর দ্বিতীয় অংশটি এসে ইমামের পেছনে এক রাকআত পড়বে। এরপর উভয় অংশই পালাক্রমে এসে নিজেদের বাকি এক রাকআত একা একা পড়ে নেবে। এভাবে উভয় অংশের এক রাকআত পড়া হবে ইমামের পিছনে এবং এক রাকআত হবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে।

এর তৃতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে ঃ ইমামের পেছনে সেনাদলের একটি অংশ দুই রাকআত পড়বে এবং তাশাহ্হুদের পর সালাম ফিরে চলে যাবে। সেনাদলের দ্বিতীয় অংশ ইমামের সাথে তৃতীয় রাকআতে শরীক হবে এবং তার সাথে আর এক রাকআত করে পড়ে সালাম ফিরবে। এভাবে ইমামের চার ও সেনাদলের দুই রাকআত হবে।

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَا تُجَٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾

১৬ রুকূ'

*হে নবী![১৪০] আমি সত্য সহকারে এই কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যে সঠিক পথ দেখিয়েছেন সেই অনুযায়ী তুমি লোকদের মধ্যে ফায়সালা করতে পারো। তুমি খেয়ানতকারী ও বিশ্বাস ভংগকারীদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হয়ো না। আর আল্লাহর কাছে ক্ষমার আবেদন করো। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়। যারা নিজেদের সাথে খেয়ানত ও প্রতারণা করে,[১৪১] তুমি তাদের সমর্থন করো না। আল্লাহ খেয়ানতকারী পাপীকে পছন্দ করেন না।*

চতুর্থ পদ্ধতিটি হচ্ছে ঃ সেনাদলের এক অংশ ইমামের সাথে এক রাকআত পড়বে এবং ইমাম যখন দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবে তখন মুকতাদীরা নিজেরাই একা একা দ্বিতীয় রাকআত তাশাহহুদ সহ পড়ে সালাম ফিরে চলে যাবে। তারপর দ্বিতীয় অংশ এসে এমন অবস্থায় ইমামের সাথে শামিল হবে যে ইমাম তখনো দ্বিতীয় রাকআতে থাকবেন এবং এরা বাকি নামায ইমামের সাথে পড়ার পর এক রাকআত নিজেরা উঠে একা একা পড়ে নেবে। এ অবস্থায় ইমামকে দ্বিতীয় রাকআতে দীর্ঘতম কিয়াম করতে হবে।

ইবনে আব্বাস, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও মুজাহিদ প্রথম পদ্ধতিটি সম্পর্কে রেওয়ায়াত করেছেন। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সম্পর্কে রেওয়ায়াত করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। হানাফীগণ এই দ্বিতীয় পদ্ধটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তৃতীয় পদ্ধতিটি রেওয়ায়াত করেছেন হাসান বসরী আবু বাকরাহ থেকে। আর চতুর্থ পদ্ধতিটিকে সামান্য একটু মতবিরোধ সহকারে ইমাম শাফেঈ ও ইমাম মালেক অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এর উৎস হচ্ছে সাহ্ল ইবনে আবী হাস্‌মার একটি রেওয়ায়াত।

এগুলো ছাড়া সালাতে খওফের আরো কয়েকটি পদ্ধতি আছে। ফিকাহর কিতাবগুলোয় এগুলোর আলোচনা পাওয়া যাবে।

১৩৭. অর্থাৎ তোমাদের এই যে সতর্কতার হুকুম দেয়া হচ্ছে এটা নিছক একটা পার্থিব কৌশল। নয়তো আসলে জয়–পরাজয় তোমাদের কৌশলের ওপর নির্ভর করে না। বরং তা নির্ভর করে আল্লাহর ফায়সালার ওপর। তাই এই সতর্কতামূলক কৌশল ও পদক্ষেপগুলো কার্যকর করার সময় তোমাদের একথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে,

যারা নিজেদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলো নিবিয়ে দিতে চাচ্ছে আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত করবেন।

১৩৮. অর্থাৎ কাফের দল। এ দলটি সে সময় ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে বাধা ও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৩৯. অর্থাৎ কাফেররা বাতিলের জন্য যে পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করছে ঈমানদাররা যদি হকের জন্য অন্তত এতটুকু কষ্টও বরদাশ্‌ত করতে না পারে তাহলে তা হবে সত্যিই বিস্ময়কর। অথচ কাফেরদের সামনে কেবল দুনিয়া ও তার ক্ষণস্থায়ী স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই নেই। বিপরীতপক্ষে ঈমানদাররা আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু পরওয়ারদিগারের সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও তাঁর চিরন্তন পুরস্কার লাভের আকাংখা পোষণ করে আসছে।

১৪০. এই রুকূ' এবং এর পরবর্তী রুকূ'তে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যাপারটি সেই যুগেই সংঘটিত হয়। ঘটনার নায়ক হচ্ছে আনসারদের যাফর গোত্রের তা'মাহ্ বা বশীর ইবনে উবাইরিক নামক এক ব্যক্তি। সে এক আনসারির বর্ম চুরি করে। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান শুরু হলে সে চোরাই মালটি এক ইহুদীর কাছে রাখে। বর্মের মালিক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করে এবং তা'মাহকে সন্দেহ করে। কিন্তু তা'মাহ, তার ভাই বেরাদাররা এবং বনি যাফরের আরো বহু লোক নিজেদের মধ্যে একমত হয়ে সেই ইহুদীটির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। ইহুদীকে জিজ্ঞেস করা হলে সে নিজের নির্দোষিতা প্রকাশ করে কিন্তু তা'মাহ্‌র পক্ষপাতিরা তার সমর্থনে খুব জোরেশোরে এগিয়ে যায়। তারা বলতে থাকে ঃ এই শয়তান ইহুদী, সেতো সত্যকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করে, তার কথা কেমন করে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? বরং আমাদের কথা মেনে নেয়া উচিত কারণ আমরা মুসলমান। এই মোকাদ্দমার বাহ্যিক ধারা বিবরণীতে প্রভাবিত হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীটির বিরুদ্ধে রায় দিতে এবং অভিযোগকারীকে বনী উবাইরিকের বিরুদ্ধে দোষারোপ করার জন্য সতর্ক করে দিতে প্রায় উদ্যত হয়েছিলেন। এমন সময় অহী নাযিল হয় এবং সমস্ত ব্যাপারটির প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দেয়া হয়।

একজন বিচারপতি হিসেবে বাহ্যিক যুক্তি প্রমাণ ও সাক্ষী সাবুদের ভিত্তিতে মোকদ্দমার মীমাংসা করা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কোন গোনাহের কাজ ছিল না। এ ধরনের অবস্থা বিচারপতিদের সামনে আসেও। অর্থাৎ মিথ্যা প্রমাণ ও সাক্ষী সাবুদের ভিত্তিতে তাদের কাছ থেকে নিজেদের সপক্ষে রায় নিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু সে সময় ইসলাম ও কুফরের মধ্যে একটি প্রচণ্ড সংঘাত চলছিল। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি মোকদ্দমার বাহ্যিক ধারা বিবরণী শুনে সেই অনুযায়ী ইহুদীর বিরুদ্ধে ফায়সালা করে দিতেন তাহলে ইসলাম বিরোধীরা তার বিরুদ্ধে এবং সমগ্র ইসলামী দল ও ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক শক্তিশালী নৈতিক হাতিয়ার পেয়ে যেতো। তারা প্রপাগাণ্ডা করতে থাকতো ঃ আহা, যাই বলেন না কেন, এখানে হক ও ইনসাফের কোন বালাই নেই। এখানেও তো সেই একই দলপ্রীতি ও অন্ধ গোত্রপ্রীতি কাজ করছে যার বিরুদ্ধে এরা নিজেরাই প্রচার অভিযান চালিয়ে আসছে। এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ বিশেষ করে এই মোকদ্দমায় হস্তক্ষেপ করেন।

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ
مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾
هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ
عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾ وَمَن يَعْمَلْ
سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾
وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿١١١﴾ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا
فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾

*এরা মানুষের কাছ থেকে নিজেদের কার্যকলাপ গোপন করতে পারে কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করতে পারে না। তিনি তো তখনো তাদের সাথে থাকেন যখন তারা রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে তিনি যা চান না এমন বিষয়ের পরামর্শ করে। আল্লাহ তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। হাঁ, তোমরা এই অপরাধীদের পক্ষ থেকে দুনিয়ার জীবনেই বিতর্ক করে নিলে কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে তাদের জন্য কে বিতর্ক করবে? সেখানে কে তাদের উকিল হবে? যদি কোন ব্যক্তি খারাপ কাজ করে বসে অথবা নিজের ওপর জুলুম করে এবং এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও পরম দয়ালু হিসেবেই পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি পাপ কাজ করবে, তার এই পাপ কাজ তার নিজের জন্যই ক্ষতিকর হবে। আল্লাহ সব কথাই জানেন, তিনি জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। আর যে ব্যক্তি কোন অন্যায় বা গোনাহর কাজ করে কোন নিরপরাধ ব্যক্তির ওপর তার দোষ চাপিয়ে দেয়, সে তো বড় মারাত্মক মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট গোনাহের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেয়।*

এই রুকূ'তে একদিকে সেসব মুসলমানদের কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করা হয়েছে যারা নিছক অন্ধ গোত্র ও পরিবার প্রীতির কারণে অপরাধীদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। অন্যদিকে সাধারণ মুসলমানদের এই মর্মে শিক্ষা দান করা হয়েছে যে, ন্যায় ও ইনসাফের

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ ؕ
وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ
أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

১৭ রুকু'

*হে নবী! তোমার প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ না হতো এবং তার রহমত যদি তোমার সাথে সংযুক্ত না থাকতো, তাহলে তাদের মধ্য থেকে একটি দলতো তোমাকে বিভ্রান্ত করার ফায়সালা করেই ফেলেছিল। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে বিভ্রান্ত করছিল না এবং তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারতো না।[১৪২] আল্লাহ তোমার ওপর কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন, এমন সব বিষয় তোমাকে শিখিয়েছেন যা তোমার জানা ছিল না এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ অনেক বেশী।*

*লোকদের অধিকাংশ গোপন সলা–পরামর্শে কোন কল্যাণ থাকে না। তবে যদি কেউ গোপনে সাদ্‌কা ও দান–খয়রাতের উপদেশ দেয় অথবা কোন সৎকাজের জন্য বা জনগণের পারস্পরিক বিষয়ের সংশোধন ও সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে কাউকে কিছু বলে, তাহলে অবশ্য এটি ভালো কথা। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে কেউ এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তাকে আমি বিরাট পুরস্কার দান করবো।*

প্রশ্নে কোন প্রকার অন্ধ বিদ্বেষ ও কওম প্রীতির অবকাশ না থাকাই উচিত। নিজের দলের লোকেরা বাতিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তাদের অযথা সমর্থন করতে হবে এবং অন্য দলের লোকেরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তাদের প্রতি অন্যায় করতে হবে—এ নীতি কখনো ন্যায়সংগত হতে পারে না।

১৪১. যে ব্যক্তি অন্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে আসলে সবার আগে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের সাথে। কারণ মন ও মস্তিষ্কের শক্তিগুলো তার কাছে

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿۱۱۵﴾

*কিন্তু যে ব্যক্তি রসূলের বিরোধিতায় কোমর বাঁধে এবং ঈমানদারদের পথ পরিহার করে অন্য পথে চলে, অথচ তার সামনে সত্য–সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, তাকে আমি সেদিকেই চালাবো যেদিকে সে চলে গেছে*[১৪৩] *এবং তাকে জাহান্নামে ঠেলে দেবো, যা নিকৃষ্টতম আবাস।*

আমানত হিসেবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। সে সেগুলোকে অযথা ব্যবহার করে তাদেরকে বিশ্বাসঘাতকতা করার ক্ষেত্রে তার সাথে সহযোগিতা করতে বাধ্য করে। আর যে বিবেককে আল্লাহ তার নৈতিক চরিত্রের পাহারাদার বানিয়েছিলেন তাকে এমনভাবে দাবিয়ে দেয় যার ফলে এই বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষেত্রে সে তাকে কোন বাধা দিতে পারে না। মানুষ তার নিজের মধ্যে অত্যাচারমূলক পদক্ষেপকে যখন এভাবে পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয় তখনই বাইরে সে বিশ্বাসঘাতকতা ও পাপ কাজ করতে শুরু করে।

১৪২. অর্থাৎ যদি তারা মিথ্যা বিবরণী পেশ করে তোমার মনে ভুল ধারণা সৃষ্টিতে সক্ষমও হতো এবং নিজেদের পক্ষে প্রকৃত সত্য ও ইনসাফ বিরোধী ফায়সালা করিয়ে নিতে পারতো তাহলে তাতে প্রকৃত ক্ষতি তাদেরই হতো। তোমার কোন ক্ষতি হতো না। কারণ আল্লাহর কাছে তুমি নও, তারাই হতো অপরাধী। যে ব্যক্তি বিচারককে ধোঁকা দিয়ে নিজের পক্ষে সত্যের বিপরীত ফায়সালা করিয়ে নেয় সে আসলে নিজেকে এই ভুল ধারণার শিকার করে যে, এই ধরনের কলা–কৌশল অবলম্বন করার ফলে সত্য তার পক্ষে এসে গেছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দৃষ্টিতে সত্য যার দিকে মূলত তার দিকেই থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে প্রতারিত বিচারপতির ফায়সালার কারণে আসল সত্যের ওপর কোন প্রভাব পড়ে না। (সূরা বাকারার ১৯৭ নম্বর টীকা দেখুন)

১৪৩. ওপরে উল্লেখিত মোকদ্দমায় আল্লাহর অহীর ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সেই বিশ্বাসঘাতক মুসলমানটির বিরুদ্ধে এবং নির্দোষ ইহুদীর পক্ষে ফায়সালা শুনিয়ে দিলেন তখন মুনাফিকটির ওপর জাহেলিয়াতের এমন প্রচণ্ড আক্রমণ হলো যার ফলে সে মদীনা ত্যাগ করে মক্কায় ইসলাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমনদের কাছে চলে গেলো এবং প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করতে লাগলো। এ আয়াতে তার এই আচরণের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١١٦﴾ إِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ إِلَّآ إِنٰثًا ۚ وَإِنْ يَّدْعُوْنَ إِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿١١٨﴾

১৮ রুকূ'

*আল্লাহ[১৪৪] কেবলমাত্র শিরকের গোনাহ মাফ করেন না। এ ছাড়া আর যাবতীয় গোনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করে, সে গোমরাহীর মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এ ধরনের লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেবীর পূজা করে। তারা সেই বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে,[১৪৫] যাকে আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন। (তারা সেই শয়তানের আনুগত্য করছে) যে আল্লাহকে বলেছিল, "আমি তোমার বান্দাদের থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়েই ছাড়বো।[১৪৬]*

১৪৪. এই রুকূ'তে ওপরের প্রসংগের জের টেনে বলা হয়েছে ঃ নিজের জাহেলিয়াতের স্রোতে ভেসে এ ব্যক্তি যে পথে পাড়ি জমিয়েছে সেটি কোন্ ধরনের পথ এবং সৎলোকদের দল থেকে আলাদা হয়ে যাদের সাথে সে জোট বেঁধেছে তারা কেমন লোক।

১৪৫. শয়তানকে কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে পূজা অর্চনা করে না বা তাকে সরাসরি আল্লাহর মর্যাদায় অভিসিক্ত করে না। এ অর্থে কেউ শয়তানকে মাবুদ বানায় না, একথা ঠিক। তবে নিজের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা আশা–আকাংখা ও চিন্তা–ভাবনার লাগাম শয়তানের হাতে তুলে দিয়ে যেদিকে সে চালায় সেদিকে চলা এবং এমনভাবে চলা যেন সে শয়তানের বান্দা এবং শয়তান তার প্রভু—এটাইতো শয়তানকে মাবুদ বানাবার একটি পদ্ধতি। এ থেকে জানা যায়, বিনা বাক্য ব্যয়ে, নির্দেশ মেনে চলা এবং অন্ধভাবে কারো হুকুম পালন করার নামই 'ইবাদাত।' আর যে ব্যক্তি এভাবে কারো আনুগত্য করে সে আসলে তার ইবাদাত করে।

১৪৬. অর্থাৎ তাদের সময়, পরিশ্রম, প্রচেষ্টা, শক্তি ও যোগ্যতা এবং তাদের সন্তান ও ধন–সম্পদ থেকে নিজের একটি অংশ নিয়ে নেবো। তাদের এমনভাবে প্ররোচিত করবো যার ফলে তারা এ সবের একটি বিরাট অংশ আমার পথে ব্যয় করবে।

وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ؕ﴿١١٩﴾

*আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো। তাদেরকে আশার ছলনায় বিভ্রান্ত করবো। আমি তাদেরকে হুকুম করবো এবং আমার হুকুমে তারা পশুর কান ছিঁড়বেই।*[১৪৭] *আমি তাদেরকে হুকুম করবো এবং আমার হুকুমে তারা আল্লাহর সৃষ্টি আকৃতিতে রদবদল করে ছাড়বেই।*[১৪৮] *যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই শয়তানকে বন্ধু ও অভিভাবক বানিয়েছে সে সুস্পষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।*

১৪৭. আরববাসীদের বহুতর কুসংস্কারের মধ্যে একটির দিকে এখানে ইশারা করা হয়েছে। তাদের নিয়ম ছিল, উটনী পাঁচটি বা দশটি বাচ্চা প্রসব করার পর তার কান চিরে তাকে তারা নিজেদের দেবতার নামে ছেড়ে দিতো এবং তাকে কোন কাজে ব্যবহার করা হারাম মনে করতো। এভাবে যে উটের ঔরশে দশটি বাচ্চা জন্ম নিতো তাকেও দেবতার নামে উৎসর্গ করা হতো। পশুর কান চিরে দেয়া দেবতার নামে উৎসর্গ করার আলামত হিসেবে বিবেচিত হতো।

১৪৮. আল্লাহর সৃষ্টি–আকৃতিতে রদবদল করার অর্থ বস্তুর সৃষ্টিকালীন কাঠামো ও আকার–আকৃতির পরিবর্তন নয়। এ অর্থ গ্রহণ করলে তো সমগ্র মানব সভ্যতা–সংস্কৃতি শয়তানের অবৈধ হস্তক্ষেপের ফসল বলে গণ্য হবে। কারণ আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুতে মানুষের হস্তক্ষেপের নামই হচ্ছে সভ্যতা ও সংস্কৃতি। আসলে এখানে যে রদবদলকে শয়তানী কাজ বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে, কোন বস্তুকে আল্লাহ যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেননি তাকে সেই কাজে লাগানো এবং যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন সে কাজে না লাগানো। অন্যকথায় বলা যায়, মানুষ নিজের ও বস্তুর প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেসব কাজ করে এবং প্রকৃতির প্রকৃত উদ্দেশ্য উপেক্ষা করে যেসব পন্থা অবলম্বন করে তা সবই এই আয়াতের প্রেক্ষিতে শয়তানের বিভ্রান্তিকর আন্দোলনের ফসল। যেমন লূত জাতির কাজ, জন্ম শাসন, বৈরাগ্যবাদ, ব্রহ্মচর্য, নারী–পুরুষের বন্ধাকরণ, পুরুষদেরকে খোজা বানানো, মেয়েদের ওপর প্রকৃতি যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে সে দায়িত্ব সম্পাদন করা থেকে তাদেরকে সরিয়ে রাখা এবং সমাজ–সংস্কৃতির এমনসব বিভাগে তাদের টেনে আনা যেগুলোর জন্য পুরুষদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব কাজ এবং শয়তানের শাগরিদরা দুনিয়ায় এ ধরনের আরো যেসব অসংখ্য কাজ করে বেড়াচ্ছে সেগুলো। আসলে এই অর্থ প্রকাশ করছে যে, তারা বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টার নির্ধারিত বিধি–বিধান ভুল মনে করে এবং তার মধ্যে সংস্কার সাধন করতে চায়।

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُولَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِىِّ أَهْلِ الْكِتَٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾

*সে তাদের কাছে ওয়াদা করে এবং তাদেরকে নানা প্রকার আশা দেয়,*[১৪৯] *কিন্তু শয়তানের সমস্ত ওয়াদা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সব লোকের আবাস হচ্ছে জাহান্নাম। সেখান থেকে নিষ্কৃতির কোন পথ তারা পাবে না। আর যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদেরকে আমি এমন সব বাগিচায় প্রবেশ করাবো যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তারা সেখানে থাকবে চিরস্থায়ীভাবে। এটি আল্লাহর সাচ্চা ওয়াদা। আর আল্লাহর চাইতে বেশী সত্যবাদী আর কে হতে পারে?*

*চূড়ান্ত পরিণতি না তোমাদের আশা–আকাংখার ওপর নির্ভর করছে, না আহলি কিতাবদের আশা–আকাংখার ওপর। অসৎকাজ যে করবে সে তার ফল ভোগ করবে এবং আল্লাহর মোকাবিলায় সে নিজের জন্য কোন সমর্থক ও সাহায্যকারী পাবেনা।*

১৪৯. শয়তানের সমস্ত কারবারটাই চলে মৌখিক ওয়াদা ও আশা–ভরসা দেবার ভিত্তিতে। সে ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক পর্যায়ে যখন মানুষকে কোন ভুল পথে পরিচালনা করতে চায়, তার সামনে এক আকাশকুসুম রচনা করে। কাউকে ব্যক্তিগত আনন্দ উপভোগ এ সাফল্যলাভের আশায় উদ্বেল করে তোলে। কাউকে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির আশ্বাস দেয়। কাউকে মানবজাতির কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান করে। কাউকে সত্যের কাছে পৌঁছে গেছে বলে মানসিক সান্ত্বনা দান করে। কারো মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে যে, আল্লাহ বা আখেরাত বলে কিছুই নেই, মরে যাওয়ার পর সবাইকে মাটিতে মিশে যেতে হবে। কাউকে আশ্বাস দেয়, আখেরাত বলে যদি কিছু থেকেও থাকে

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ
اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ
اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿١٢٥﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ
شَىْءٍ مُّحِيْطًا ﴿١٢٦﴾

*আর যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করবে, সে পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, তবে যদি সে মু'মিন হয়, তাহলে এই ধরনের লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের এক অণুপরিমাণ অধিকারও হরণ করা হবে না। সেই ব্যক্তির চাইতে ভালো আর কার জীবনধারা হতে পারে, যে আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছে, সৎনীতি অবলম্বন করেছে এবং একনিষ্ঠ হয়ে ইবরাহীমের পদ্ধতি অনুসরণ করেছে? সেই ইবরাহীমের পদ্ধতি যাকে আল্লাহ নিজের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিলেন। আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর।[১৫০] আর আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।[১৫১]*

তাহলে উমুক হুজুরের বদৌলতে, উমুকের দোয়ার তোফায়েলে সেখানকার ধর-পাকড় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। মোটকথা যাকে যে ধরনের আশার ছলনায় ভুলানো যায় তাকে সেভাবে নিজের প্রতারণা জালে ফাঁসাবার চেষ্টা করে।

১৫০. অর্থাৎ আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মাথা নত করে দেয়া এবং আত্মম্ভরিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে বিরত থাকা প্রকৃত সত্যের সাথে যথার্থ সামঞ্জস্যশীল হবার কারণে সর্বোত্তম পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। আল্লাহ যখন পৃথিবী, আকাশ ও এর মধ্যকার যাবতীয় বস্তুর মালিক তখন তার আনুগত্য ও বন্দেগী করতে প্রস্তুত হওয়া এবং বিদ্রোহী মনোভাব পরিহার করাই হচ্ছে মানুষের জন্য সঠিক পন্থা।

১৫১. অর্থাৎ মানুষ যদি আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মাথা নত না করে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক আচরণ থেকে বিরত না হয় তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে রক্ষা করে সে কোথাও পালিয়ে যেতে পারে না। আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও কুদরাত চারদিক থেকে তাকে বেষ্টন করে আছে।

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

১৯ রুকূ'

*লোকেরা মেয়েদের ব্যাপারে তোমার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করছে।*[১৫২] *বলে দাও, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ফতোয়া দেন এবং একই সাথে সেই বিধানও স্মরণ করিয়ে দেন, যা প্রথম থেকে এই কিতাবে তোমাদের শুনানো হচ্ছে।*[১৫৩] *অর্থাৎ এই এতিম মেয়েদের সম্পর্কিত বিধানসমূহ, যাদের হক তোমরা আদায় করছো না*[১৫৪] *এবং যাদেরকে বিয়ে দিতে তোমরা বিরত থাকছো (অথবা লোভের বশবর্তী হয়ে নিজেরাই যাদেরকে বিয়ে করতে চাও)।*[১৫৫] *আর যে শিশুরা কোন ক্ষমতা রাখে না তাদের সম্পর্কিত বিধানসমূহ।*[১৫৬] *আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, এতিমদের সাথে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ইনসাফের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকো এবং যে কল্যাণ তোমরা করবে তা আল্লাহর অগোচর থাকবে না।*

১৫২. একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, মেয়েদের ব্যাপারে লোকেরা কি জিজ্ঞেস করে। তবে পরে যে ফতোয়া দেয়া হয়েছে তা থেকে প্রশ্নের ধরন স্বতস্ফূর্তভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

১৫৩. এটা আসল প্রশ্নের জওয়াব নয়। তবে লোকদের প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার পূর্বে আল্লাহ এই সূরার শুরুতে বিশেষ করে এতিম মেয়েদের সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে এতিম শিশুদের ব্যাপারে যেসব বিধি–বিধান বর্ণনা করেছিলেন সেগুলো যথাযথভাবে মেনে চলার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। আল্লাহর দৃষ্টিতে এতিমদের অধিকারের গুরুত্ব যে কত বেশী এ থেকে তা সহজেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম দুই রুকূ'তে তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য জোর তাকীদ করা হয়েছিল। কিন্তু তাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি। কাজেই এখন সামাজিক প্রসংগের আলোচনা আসতেই লোকদের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেয়ার পূর্বেই আল্লাহ নিজেই এতিমদের স্বার্থের প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

১৫৪. সেই আয়াতটির দিকে ইংগিত করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে ঃ "যদি এতিমদের সাথে বেইনসাফী করতে ভয় পাও তাহলে যেসব মেয়েদের তোমরা পছন্দ করো........." (সূরা আননিসা, ৩)

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

*যখনই[১৫৭] কোন স্ত্রীলোক নিজের স্বামীর কাছ থেকে অসদাচরণ অথবা উপেক্ষা প্রদর্শনের আশংকা করে, তারা দু'জনে (কিছু অধিকারের কমবেশীর ভিত্তিতে) যদি পরস্পর সন্ধি করে নেয়, তাহলে এতে কোন দোষ নেই। যে কোন অবস্থায়ই সন্ধি উত্তম।[১৫৮] মন দ্রুত সংকীর্ণতার দিকে ঝুঁকে পড়ে।[১৫৯] কিন্তু যদি তোমরা পরোপকার করো ও আল্লাহভীতি সহকারে কাজ করো, তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের এই কর্মনীতি সম্পর্কে অনবহিত থাকবেন না।[১৬০] স্ত্রীদের মধ্যে পুরোপুরি ইনসাফ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা চাইলেও এ ক্ষমতা তোমাদের নেই। কাজেই (আল্লাহর বিধানের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এটিই যথেষ্ট যে,) এক স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অন্য স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়বে না।[১৬১] যদি তোমরা নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।[১৬২] কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পর থেকে আলাদা হয়েই যায়, তাহলে আল্লাহ তার বিপুল ক্ষমতার সাহায্যে প্রত্যেককে অন্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি মহাজ্ঞানী।*

১৫৫. ترغبون ان تنكحوهن এর এ অর্থও হতে পারে ঃ "তোমরা তাদেরকে বিয়ে করার আগ্রহ পোষণ করো।" আবার এ অর্থও হতে পারে, "তোমরা তাদেরকে বিয়ে করা পছন্দ কর না।" হযরত আয়েশা (রা) এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ কিছু লোকের অভিভাবকত্বে এমন কিছু এতিম মেয়ে ছিল, যাদের কাছে কিছু পৈতৃক ধন-সম্পত্তি ছিল।

তারা এই মেয়েগুলোর ওপর নানাভাবে জুলুম করতো। মেয়েরা সম্পদশালিনী হবার সাথে সাথে সুন্দরী হলে তারা তাদের বিয়ে করতে চাইতো এবং মোহরানা ও খোরপোষ আদায় না করেই তাদের সম্পদ ও সৌন্দর্য উভয়টিই ভোগ করতে চাইতো। আর তারা অসুন্দর বা কুৎসিত হলে নিজেরা তাদের বিয়ে করতো না এবং অন্য কারো সাথে তাদের বিয়ে দিতেও চাইতো না। কারণ অন্য কারো সাথে বিয়ে দিলে এমন কোন শক্ত মালিক পক্ষ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল, যে তাদের থেকে এতিমদের হক বুঝে নেয়ার দাবী করতো।

১৫৬. এই সূরার প্রথম ও দ্বিতীয় রুকূ'তে এতিমদের অধিকার সম্পর্কে যে সমস্ত বিধান বর্ণিত হয়েছে এখানে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৫৭. আসল প্রশ্নের জবাব এখান থেকে শুরু হচ্ছে। এ জবাবটি বুঝতে হলে প্রথমে প্রশ্নটি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। জাহেলী যুগে এক ব্যক্তি অসংখ্য বিয়ে করতে পারতো। এ ব্যাপারে তার অবাধ স্বাধীনতা ছিল। আর এই অসংখ্য স্ত্রীদের জন্য কোন অধিকারও সংরক্ষিত ছিল না। সূরা নিসার প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হবার পর এই স্বাধীনতার ওপর দু' ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়। এক, স্ত্রীদের সংখ্যা সর্বাধিক চারের মধ্যে সীমিত করে দেয়া হয়। দুই, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার জন্য 'আদল' (অর্থাৎ সবদিক দিয়ে সমান ব্যবহার) এর শর্ত আরোপ করা হয়। এখানে প্রশ্ন ওঠে, যদি কোন ব্যক্তির স্ত্রী বন্ধ্যা হয় বা চিররুগ্না হয় অথবা কোন ক্রমেই তার স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্ক বজায় রাখার যোগ্যতা না থাকে এবং এ অবস্থায় স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে তাহলে কি উভয়ের প্রতি সমান আকর্ষণ অনুভব করা, সমান ভালোবাসা পোষণ করা এবং উভয়ের সাথে সমান দৈহিক সম্পর্ক রা[illegible] তার জন্য অপরিহার্য গণ্য হবে? আর যদি সে এমনটি না করে, তাহলে আদলের শর্ত কি এটাই দাবী করে যে, দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার পূর্বে সে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেবে? এছাড়াও প্রথম স্ত্রী নিজেই যদি বিচ্ছিন্ন হতে না চায় তাহলে কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা বোঝাপড়ার মাধ্যমে যে স্ত্রী আকর্ষণহীন হয়ে পড়েছে সে স্বেচ্ছায় নিজের কিছু অধিকার ত্যাগ করে তাকে তালাক দেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য স্বামীকে রাজী করতে পারে? এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা কি আদলের বিরোধী হবে? সংশ্লিষ্ট আয়াতটিতে উপরোল্লিখিত প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়া হয়েছে।

১৫৮. অর্থাৎ তালাক ও বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে যে স্ত্রী তার জীবনের একটি অংশ এক স্বামীর সাথে অতিবাহিত করেছে এভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও চুক্তির মাধ্যমে বাকি জীবনটা তারই সাথে অবস্থান করাটাই উত্তম।

১৫৯. স্ত্রী যদি নিজের মধ্যে স্বামীর জন্য আকর্ষণহীনতার কারণ অনুভব করতে থাকে এবং এরপরও সে স্বামীর কাছ থেকে একজন আকর্ষণীয় স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার প্রত্যাশা করে তাহলে এটিই হবে সেই স্ত্রীর মনের সংকীর্ণতা। আর স্বামী যদি এমন কোন স্ত্রীকে সীমাতিরিক্তভাবে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে এবং তার অধিকার অসহনীয় পর্যায়ে ছিনিয়ে নিতে চায়, যে স্ত্রী স্বামীর মনরাজ্যে সকল প্রকার আকর্ষণ হারিয়ে বসার পরও তার সাথে অবস্থান করতে চায়, তাহলে এটি হবে স্বামীর পক্ষ থেকে মনের সংকীর্ণতার পরিচয়।

১৬০. এখানে আল্লাহ আবার পুরুষেরই উদার মনোবৃত্তির প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। এ ধরনের ব্যাপারে এটিই আল্লাহর রীতি। তিনি সকল প্রকার আকর্ষণহীনতা সত্ত্বেও মেয়েটির

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٣٢﴾ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿١٣٣﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿١٣٤﴾

*আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও আল্লাহকে ভয় করে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। তোমরা না মানতে চাও না মানো, কিন্তু আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি অভাব মুক্ত ও সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। হাঁ, আল্লাহ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। আর কার্যসম্পাদনের জন্য তিনিই যথেষ্ট। তিনি চাইলে তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে তোমাদের জায়গায় অন্যদেরকে নিয়ে আসবেন এবং তিনি এ ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। যে ব্যক্তি কেবলমাত্র ইহকালের পুরস্কার চায়, তার জেনে রাখা উচিত, আল্লাহর কাছে ইহকাল ও পরকাল উভয়স্থানের পুরস্কার আছে এবং আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।*[১৬৩]

সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করার জন্য পুরুষের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। কেননা মেয়েটি বছরের পর বছর ধরে তার জীবন সঙ্গিনী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছে। এই সংগে আল্লাহকে ভয় করারও নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা কোন মানুষের ভুল-ত্রুটির কারণে তিনি তার দিক থেকে যদি নিজের কৃপাদৃষ্টি ফিরিয়ে নেন এবং তার ভাগ্যের অংশ হ্রাস করে দেন, তাহলে দুনিয়ায় তার আশ্রয় লাভ করার আর কোন স্থানই থাকে না।

১৬১. এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ সব অবস্থায় একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে সব দিক দিয়ে পূর্ণ সাম্য কায়েম করতে পারে না। একটি স্ত্রী সুন্দরী রূপসী এবং অন্যটি কুৎসিত। একজন যুবতী এবং অন্যজন বিগত যৌবনা। একজন চির রুগ্না ও অন্যজন সবল স্বাস্থ্যবতী। একজন কর্কশ স্বভাবের ও কটূভাষিণী এবং অন্যজন মধুর প্রকৃতির ও মিষ্টভাষিণী। স্ত্রীদের মধ্যে

এ ধরনের আরো বিভিন্ন প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকতে পারে। এর ফলে স্বভাবতই এক স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ বেশী ও অন্য স্ত্রীর প্রতি কম হতে পারে। এহেন অবস্থায় আইন এ দাবী করে না যে, ভালোবাসা, আকর্ষণ ও দৈহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ সমতা কায়েম রাখা অপরিহার্য। বরং আইন কেবল এতটুকু দাবী করে, যখন তুমি আকর্ষণহীনতা সত্ত্বেও একটি মেয়েকে তালাক দিচ্ছো না এবং নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বা তার কামনা অনুযায়ী তাকে নিজের স্ত্রীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখছো, তখন তার সাথে অবশ্যি এতটুকু সম্পর্ক রাখো যার ফলে সে কার্যত স্বামীহীনা হয়ে না পড়ে। এ অবস্থায় এক স্ত্রীর তুলনায় অন্য স্ত্রীর প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়া ও তার প্রতি বেশী অনুরক্ত হওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু অন্য স্ত্রীর প্রতি যেন এমনভাবে অবহেলা ও অনীহা প্রদর্শিত না হয় যার ফলে মনে হতে থাকে যে, তার কোন স্বামীই নেই।

এ আয়াত থেকে কেউ কেউ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কুরআন একদিকে আদলের শর্ত সহকারে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয় আবার অন্যদিকে আদলকে অসম্ভব গণ্য করে এই অনুমতিকে কার্যত বাতিল করে দেয়। কিন্তু আসলে এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন অবকাশই এ আয়াতে নেই। কুরআন যদি কেবল এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হতো যে, "তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে আদল কায়েম করতে পারবে না," তাহলে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ থাকতো। কিন্তু এর পরপরই বলা হয়েছে, "কাজেই এক স্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না।" এ বাক্যটি উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন সুযোগই এখানে রাখেনি। খৃষ্টবাদী ইউরোপের কিছু নকলনবিশ এ ব্যাপারে নিতান্ত উদ্ভট সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন।

১৬২. অর্থাৎ যদি তোমরা যথাসম্ভব ইচ্ছা করে জুলুম না করো এবং ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিতে থাকো, তাহলে স্বাভাবিক অক্ষমতার কারণে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির ব্যাপারে সামান্য যা ভুলচুক তোমরা করবে আল্লাহ তা মা'ফ করে দেবেন।

১৬৩. সাধারণভাবে আইন সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর এবং বিশেষভাবে সমাজ সভ্যতার যেসব অংশে মানুষ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অন্যায় ও জুলুম করে আসছে সেসব অংশের সংস্কার ও সংশোধনের ওপর জোর দেবার পর আল্লাহ তাআলা অবশ্যি এ ধরনের কয়েকটি প্রভাবশালী ও আকর্ষণীয় বাক্যের মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত উপদেশমূলক ভাষণ দিয়ে থাকেন। মানুষকে ঐ বিধানগুলো পালনে উদ্বুদ্ধ করাই এর উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে যেহেতু মেয়েদের ও এতিম ছেলেমেয়েদের সাথে ইনসাফ ও সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাই এরপর ঈমানদারদের মনের মধ্যে কিছু কথা গেঁথে দেবার প্রয়োজন বোধ করা হয়েছে।

প্রথম কথা হচ্ছে ঃ কারো ভাগ্য ভাঙা-গড়ার ক্ষমতা তোমার আছে এ ধরনের ভুল ধারণা কখনো পোষণ করো না। তোমার অনুগ্রহের হাত টেনে নিলেই দুনিয়ায় তার আর কোন আশ্রয়ই থাকবে না। এটা সম্পূর্ণ একটা অমূলক ধারণা। এ ধারণায় বিন্দু পরিমাণও সত্যতা নেই। কেননা তোমার, তার ও সবার ভাগ্য আল্লাহর হাতে। তোমার একার মাধ্যমে আল্লাহ তার বান্দাদের সাহায্য করেন না। আকাশ ও পৃথিবীর মালিক মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর মাধ্যম ও উপায় উপকরণ অত্যন্ত ব্যাপক ও সীমা সংখ্যাহীন। নিজের উপায় উপকরণগুলোকে কাজে লাগাবার এবং সেগুলোর সাহায্যে কার্যোদ্ধার করার কৌশলও তার আয়ত্বাধীন।

দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে ঃ তোমাদের এবং তোমাদের মতো পূর্ববর্তী সমস্ত নবীর উম্মাতদের হামেশা এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের যাবতীয় কাজে আল্লাহকে ভয় করো। এ নির্দেশ মেনে চললে তোমাদের লাভ, আল্লাহর কোন লাভ নেই। আর যদি তোমরা এর বিরুদ্ধাচরণ করো, তাহলে পূর্ববর্তী উম্মাতরা এ ধরনের নাফরমানী করে যেমন আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারেনি তেমনি তোমরাও পারবে না। এই বিশ্ব–জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি পূর্বেও কারো পরোয়া করেননি এবং এখনো তোমাদের পরোয়া করে না। তার হুকুম অমান্য করলে তিনি তোমাদের সরিয়ে দিয়ে অন্য একটি জাতিকে সাফল্যের স্বর্ণচূড়ায় বসিয়ে দেবেন। আর এই ময়দান থেকে তোমাদের সরে যাওয়ার ফলে তার সাম্রাজের বিপুল বৈভবে ও রূপ সৌন্দর্যে একটুও পার্থক্য দেখা দেবে না।

তৃতীয়ত, আল্লাহর কাছে একদিকে যেমন দুনিয়ার স্বার্থ সুযোগ–সুবিধা আছে তেমনি অন্যদিকে আছে আখেরাতের কল্যাণও। এই স্বার্থ, সুযোগ–সুবিধা ও কল্যাণ সাময়িক আবার চিরন্তনও। এখন তোমরা তাঁর কাছ থেকে কোন ধরনের সুযোগ–সুবিধা ও কল্যাণ লাভ করতে চাও তা তোমাদের নিজেদের সামর্থ, হিম্মত, সাহস ও আকাংখার ওপর নির্ভর করে। যদি তোমরা নিছক দুনিয়ার কয়েকদিনের স্বার্থলাভের জন্য পাগলপারা হয়ে গিয়ে থাকো এবং তার বিনিময়ে চিরন্তন স্বার্থসমূহ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হও, তাহলে আল্লাহ এসব কিছু তোমাদের এখনই এখানেই দিয়ে দেবেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আখেরাতের চিরন্তন স্বার্থ ও সুযোগ সুবিধা লাভের কোন অংশই তোমরা পাবে না। নদী তোমাদের শস্যক্ষেতগুলোতে চিরকাল পানি সিঞ্চন করতে প্রস্তুত। কিন্তু তোমাদের নিজেদের মনের সংকীর্ণতা এবং সাহস, হিম্মত ও মনোবলের অভাবের কারণে তোমরা কেবলমাত্র একটি শস্য মওসূমের পানি সিঞ্চনকে চিরন্তন খরার বিনিময়ে ক্রয় করছো। কাজেই হৃদয় প্রশস্ত করে আনুগত্য ও বন্দেগীর এমন পথ অবলম্বন করো যার ফলে তোমরা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের স্বার্থ ও সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারো।

সবশেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ অন্ধ ও বধির নন। কোন অজ্ঞ ও গাফেল রাজার মতো চোখ কান বন্ধ করে আন্দাজে কাজ করা এবং নিজের দান ও দয়া–দাক্ষিণ্যের ক্ষেত্রে ভালো–মন্দের পার্থক্য না করা তার রীতি নয়। পূর্ণ সচেতনতার সাথে তিনি তার এই বিশ্ব–জাহানের ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেকের গ্রহণ ক্ষমতা, হিম্মত ও মনোবলের ওপর তিনি দৃষ্টি রেখেছেন। প্রত্যেকের গুণাবলী তিনি জানেন। তোমাদের কে কোন পথে নিজের শ্রম ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছে, তাও তিনি ভালো করেই জানেন তিনি অনুগত বান্দাদের জন্য যেসব অনুগ্রহ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তোমরা তার নাফরমানীর পথ অবলম্বন করে সেগুলো লাভের আশা করতে পারো না।

১৬৪. আল্লাহ কেবল এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি যে, তোমরা ইনসাফের দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করো এবং ইনসাফের পথে চলো বরং বলেছেন তোমরা ইনসাফের পতাকাবাহী হয়ে যাও। কেবল ইনসাফ করাই তোমাদের কাজ হবে না বরং ইনসাফের ঝাণ্ডা নিয়ে এগিয়ে চলাই হবে তোমাদের কাজ। জুলুম খতম করে তার জায়গায় আদল ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে তোমাদের দৃঢ় সংকল্প হতে হবে। আদল ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى
اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ
اَوْلٰى بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾ يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا
بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ
اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾

২০ রুকূ’

*হে ঈমানদারগণ! ইনসাফের পতাকাবাহী[১৬৪] ও আল্লাহর সাক্ষী হয়ে যাও,[১৬৫] তোমাদের ইনসাফ ও সাক্ষ তোমাদের নিজেদের ব্যক্তিসত্তার অথবা তোমাদের বাপ–মা ও আত্মীয়–স্বজনদের বিরুদ্ধে গেলেও। উভয় পক্ষ ধনী বা অভাবী যাই হোক না কেন আল্লাহ তাদের চাইতে অনেক বেশী কল্যাণকামী। কাজেই নিজেদের কামনার বশবর্তী হয়ে ইনসাফ থেকে বিরত থেকো না। আর যদি তোমরা পেঁচালো কথা বলো অথবা সত্যতাকে পাশ কাটিয়ে চলো, তাহলে জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তার খবর রাখেন।*

*হে ঈমানদারগণ। ঈমান আনো[১৬৬] আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি, আল্লাহ তাঁর রসূলের ওপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি এবং পূর্বে তিনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাবর্গ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ ও পরকালের প্রতি কুফরী করলো[১৬৭] সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূর চলে গেলো।*

যে সহায়ক শক্তির প্রয়োজন মু’মিন হিসেবে তোমাদের যোগান দিতে হবে সেই সহায়ক শক্তি।

১৬৫. অর্থাৎ তোমাদের সাক্ষ একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া উচিত। এতে কারো প্রতি দরদ ও সহানুভূতির কোন প্রশ্ন থাকবে না। কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি অর্জন তোমাদের লক্ষ হবে না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾

*অবশ্যি যেসব লোক ঈমান এনেছে তারপর কুফরী করেছে, আবার ঈমান এনেছে আবার কুফরী করেছে, তারপর নিজেদের কুফরীর মধ্যে এগিয়ে যেতে থেকেছে,[১৬৮] আল্লাহ কখনো তাদেরকে মাফ করবেন না এবং কখনো তাদেরকে সত্য–সঠিক পথও দেখাবেন না।*

১৬৬. যারা পূর্বেই ঈমান এনেছে তাদেরকে আবার বলা, 'তোমরা ঈমান আনো'—কথাটা আপাত দৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হয়। কিন্তু আসলে এখানে 'ঈমান' শব্দটি দু'টি আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈমান আনার একটি অর্থ হচ্ছে অস্বীকৃতির পরিবর্তে স্বীকৃতির পথ অবলম্বন করা। অস্বীকারকারীদের থেকে আলাদা হয়ে স্বীকৃতিদানকারীদের দলে শামিল হয়ে যাওয়া। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ঃ কোন জিনিসকে সাচ্চা দিলে, সরল অন্তঃকরণে এবং পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতা সহকারে মেনে নেয়া। নিজের চিন্তা, রুচি, পছন্দ, দৃষ্টিভংগী, মনোভাব, চাল–চলন এবং নিজের বন্ধুতা, শত্রুতা ও প্রচেষ্টা–সংগ্রামের সকল ক্ষেত্রকে সে যে আকীদার ওপর ঈমান এনেছে পুরোপুরি সেই অনুযায়ী ঢেলে সাজানো। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে যেসব মুসলমান স্বীকারকারীদের অন্তরভুক্ত হয় এ আয়াতে তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের কাছে দাবী করা হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থটির পেক্ষিতে তোমরা সাচ্চা মু'মিনে পরিণত হও।

১৬৭. কুফরী করারও দু'টি অর্থ হয়। এর একটি অর্থ হচ্ছে, সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অস্বীকার করা। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, মুখে মেনে নেয়া কিন্তু মনে মনে অস্বীকার করা। অথবা নিজের মনোভাবের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করা যে, সে যে জিনিসটি মেনে নেয়ার দাবী করছে আসলে সেটিকে মানে না। এখানে কুফরী শব্দটি এই দু'টি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামের এই বুনিয়াদী আকীদাগুলোর ব্যাপারে উপরোল্লিখিত দুই ধরনের কুফরীর মধ্য থেকে যে কোনটি অবলম্বন করা হবে তার ফল হবে কেবল হক থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং বাতিলের পথে নিষ্ফল প্রয়াসে মাথা খুঁড়ে মরা। এ বিষয়টি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দেয়াই এই আয়াতটির উদ্দেশ্য।

১৬৮. এখানে সেইসব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা দ্বীনকে নিছক একটি হাল্‌কা প্রমোদ ও চিত্তবিনোদন হিসেবে গ্রহণ করে। যারা দ্বীনকে একটি খেল্‌না বানিয়ে নিজেদের কল্পনা ও কামনার রশি দিয়ে ইচ্ছেমতো তাকে ঘোরাতে থাকে তাদের কথাই এখানে আলোচিত হয়েছে। চিন্তার জগতে একটা আলোড়ন উঠলো আর অমনি মুসলমান হয়ে গেলো। তারপর আর একটা আলোড়ন উঠলো আর অমনি কাফের হয়ে গেলো। অথবা যখন দেখা গেলো মুসলমান হয়ে গেলে বৈষয়িক স্বার্থ হাসিল করা যাবে তখন মুসলমান হয়ে গেলো। আবার যখন স্বার্থের খুঁটি ঘুরে গেলো তখন তার পদসেবা করার জন্য নির্দ্বিধায় সেদিকে চলে গেলো। এ ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফেরাত বা হিদায়াত

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا ﴿١٣٨﴾ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ﴿١٤٠﴾

*আর যেসব মুনাফিক ঈমানদারদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু বানায় তাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে, এ 'সুসংবাদটি' তাদেরকে জানিয়ে দাও। এরা কি মর্যাদা লাভের সন্ধানে তাদের কাছে যায়?[১৬৯] অথচ সমস্ত মর্যাদা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ এই কিতাবে তোমাদের পূর্বেই হুকুম দিয়েছেন, যেখানে তোমরা আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে কুফরী কথা বলতে ও তার প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতে শুনবে সেখানে বসবে না, যতক্ষণ না লোকেরা অন্য প্রসংগে ফিরে আসে। অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হবে।[১৭০] নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদেরকে জাহান্নামে একই জায়গায় একত্র করবেন।*

কিছুই নেই। "তারপর নিজেদের কুফরীর মধ্যে তারা এগিয়ে যেতেই থাকলো"—এখানে একথা বলার অর্থ হচ্ছে ঃ কোন ব্যক্তি কেবল কাফের হয়ে গিয়েই ক্ষান্ত হয় না। বরং এরপর সে অন্য লোকদেরকেও ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে। ইসলামের বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্ত করে এবং প্রকাশ্যে নানা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে। কুফরীর শির উন্নত করার এবং তার মোকাবিলায় আল্লাহর দ্বীনের ঝাণ্ডা ধূলায় লুণ্ঠিত করার জন্য নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালায়। এটিকেই বলে কুফরীতে আরো উন্নতি হওয়া, কুফরী আরো বেড়ে যাওয়া এবং একটি অপরাধের পর আর একটি অপরাধ তারপর আর একটি অপরাধ—এভাবে অপরাধের ফিরিস্তি ক্রমাগত বেড়ে যাওয়া। পরিণামে এ শাস্তিও নিছক কুফরী থেকে অনেক বেশী হতে হবে।

১৬৯. এখানে মূল আয়াতে 'ইজ্জত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় 'ইজ্জত' শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সাধারণত ইজ্জত শব্দটি বললে মান, মর্যাদা, সম্মান ইত্যাদি

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

*এই মুনাফিকরা তোমাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করছে। তারা দেখছে পানি কোন্ দিকে গড়ায়। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় সূচিত হয় তাহলে তারা এসে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? আর যদি কাফেরদের পাল্লা ভারী থাকে তাহলে তাদেরকে বলবে, আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম ছিলাম না? এরপরও আমরা মুসলমানদের হাত থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছি।[১৭১] কাজেই কিয়ামতের দিন তোমাদের ও তাদের ব্যাপারে ফায়সালা আল্লাহই করে দেবেন। আর (এই ফায়সালায়) আল্লাহ কাফেরদের জন্য মুসলমানদের ওপর বিজয় লাভ করার কোন পথই রাখেননি।*

বুঝানো হয়; কিন্তু আরবীতে 'ইজ্জত' শব্দের অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তির মর্যাদা এতই উন্নত ও সংরক্ষিত হয়ে যাওয়া যার ফলে কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। অন্য কথায় 'ইজ্জত' শব্দটির অর্থে বলা যায়, যে মর্যাদা বিনষ্ট করার ক্ষমতা কারো নেই।

১৭০. অর্থাৎ এক ব্যক্তি মুসলিম হবার দাবী করা সত্ত্বেও যদি কাফেরদের এমন সব বৈঠকে–সমাবেশে–আলোচনায় শরীক হয় যেখানে আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে কুফরী বাক্য উচ্চারিত হয় এবং সে ঠাণ্ডা মাথায় নিশ্চিত মনে আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে লোকদের বিদ্রূপাত্মক উক্তি ও সমালোচনা শুনতে থাকে, তাহলে তার ও ঐ কাফেরদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। (এই আয়াতে যে হুকুমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সূরা আনআমের ৬৮ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে)।

১৭১. এটিই প্রত্যেক যুগের মুনাফিকদের বৈশিষ্ট। মৌখিক স্বীকারোক্তি ও ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে নামমাত্র প্রবেশের মাধ্যমে মুসলমান হিসেবে যতটুকু স্বার্থ ভোগ করা যায় তা তারা ভোগ করে। আবার অন্যদিকে কাফের হিসেবে যে স্বার্থটুকু ভোগ করা সম্ভব তা ভোগ করার জন্য তারা কাফেরদের সাথে যোগ দেয়। তারা সর্বোতভাবে কাফেরদের বিশ্বাসভাজন হবার চেষ্টা করে। তাদেরকে বলে ঃ আমরা মোটেই "গোঁড়া ও বিদ্বেষপরায়ণ" মুসলমান নই। মুসলমানদের সাথে আমাদের অবশ্যি নামের সম্পর্ক আছে। কিন্তু আমাদের মানসিক ঝোঁক, আগ্রহ ও বিশ্বস্ততা রয়েছে তোমাদের প্রতি। চিন্তা–ভাবনা, আচার–ব্যবহার, রুচি–প্রকৃতি ইত্যাদি সব দিক দিয়ে তোমাদের সাথে আমাদের গভীর মিল। তাছাড়া ইসলাম ও কুফরীর সংঘর্ষে আমরা তোমাদের পক্ষই অবলম্বন করবো।

إِنَّ الْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى الصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

২১ রুকূ'

*এই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করছে। অথচ আল্লাহই তাদেরকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখে দিয়েছেন। তারা যখন নামাযের জন্য ওঠে, আড়মোড়া ভাংতে ভাংতে শৈথিল্য সহকারে নিছক লোক দেখাবার জন্য ওঠে এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।*[১৭২] *কুফর ও ঈমানের মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে, না পুরোপুরি এদিকে, না পুরোপুরি ওদিকে। যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন তার জন্য তুমি কোন পথ পেতে পারো না।*[১৭৩]

১৭২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় কোন ব্যক্তি নিয়মিত নামায না পড়ে মুসলমানদের দলের অন্তরভুক্ত হতে পারতো না। দুনিয়ার বিভিন্ন দল ও মজলিস যেমন তাদের বৈঠকগুলোতে কোন সদস্যের বিনা ওজরে অনুপস্থিত থাকাকে দলের প্রতি তার অনাগ্রহ মনে করে থাকে এবং পরপর কয়েকটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ বাতিল করে তাকে দল থেকে বের করে দেয়, ঠিক তেমনি ইসলামী জামায়াতের কোন সদস্যের জামায়াতের সাথে নামাযে গরহাযির থাকাকে সে জামানায় সে ব্যক্তির ইসলামের প্রতি অনাগ্রহের সুস্পষ্ট প্রমাণ মনে করা হতো। আর যদি সে অনবরত কয়েক বার জামায়াতে গরহাযির থাকতো তাহলে ধরে নেয়া হতো সে মুসলমান নয়। তাই বড় বড় কট্টর মুনাফিকদেরও সে যুগে পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে হাযিরি দিতে হতো। কারণ এ ছাড়া তাদের মুসলমানদের দলের অন্তরভুক্ত থাকার আর দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না। তবে যে জিনিসটা তাদের সাচ্চা ঈমানদার থেকে আলাদা করতো সেটি হচ্ছে এই যে, সাচ্চা মু'মিনরা বিপুল উৎসাহ আগ্রহ নিয়ে মসজিদে আসতো, জামায়াতের সময়ের পূর্বেই মসজিদে পৌঁছে যেতো এবং নামায শেষ হবার পরও মসজিদে বসে থাকতো। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতো যে নামাযের প্রতি তাদের যথার্থই হৃদয়ের টান ও আগ্রহ রয়েছে। বিপরীত পক্ষে আযানের আওয়াজ কানে আসতেই মুনাফিকদের যেন জান বেরিয়ে যেতো। মন চাইতো না তবুও নেহাত দায়ে ঠেকে তারা উঠতো। তাদের মসজিদের দিকে আসার ধরন দেখে পরিষ্কার বুঝা যেতো যে স্বতস্ফূর্তভাবে তারা আসছে না বরং অনিচ্ছায় নিজেদের টেনে টেনে আনছে। জামায়াত শেষ হবার পর এমনভাবে মসজিদ থেকে পালাতো যেন মনে হতো কয়েদীরা বন্দীশালা থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাদের

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ
فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ
تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ
مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾
مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا
عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

*হে ঈমানদারগণ! মু'মিনদের বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর হাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ তুলে দিতে চাও? নিশ্চিত জেনো, মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে চলে যাবে এবং তোমরা কাউকে তাদের সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না। তবে তাদের মধ্য থেকে যারা তাওবা করবে, নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেবে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং নিজেদের দীনকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নেবে,[১৭৪] তারা মু'মিনদের সাথে থাকবে। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই মু'মিনদেরকে মহাপুরস্কার দান করবেন। আল্লাহর কী প্রয়োজন তোমাদের অযথা শাস্তি দেবার, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকো।[১৭৫] এবং ঈমানের নীতির ওপর চলো? আল্লাহ বড়ই পুরস্কার দানকারী[১৭৬] ও সর্বজ্ঞ।*

ওঠাবসা চলাফেরা তথা প্রতিটি পদক্ষেপ সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতো যে, আল্লাহর যিকিরের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্রও মানসিক টান ও আগ্রহ নেই।

১৭৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর কালাম ও রসূলের জীবন চরিত থেকে হিদায়াত লাভ করেনি, যাকে সত্য বিমুখ ও বাতিলের প্রতি গভীর অনুরাগী দেখে আল্লাহও তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন যেদিকে সে নিজে ফিরে যেতে চায় এবং তার গোমরাহীকে আঁকড়ে ধরার কারণে আল্লাহ তার জন্য হিদায়াতের দরজা বন্ধ করে কেবল মাত্র গোমরাহীর দরজা খুলে দিয়েছেন। এহেন ব্যক্তিকে সঠিক পথ দেখানো আসলে কোন মানুষের সাধ্যের অতীত। রিযিকের দৃষ্টান্ত থেকে এ বিষয়টি অনুধাবন করা যেতে পারে।

রিযিকের সমস্ত সম্পদ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমতা ও কুদরতের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন, এটা একটা জাজ্জ্বল্যমান সত্য। মানুষ যা কিছু পায়, যতটুকু পায় আল্লাহর কাছ থেকেই পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি যে পথে রিযিক চায় আল্লাহ তাকে সেই পথেই রিযিক দান করেন। যদি কোন ব্যক্তি হালাল পথে রিযিক চায় এবং সেজন্য প্রচেষ্টাও চালাতে থাকে তাহলে আল্লাহ তার জন্য রিযিকের হালাল পথগুলো খুলে দেন। তার নিয়ত যে পরিমাণ সৎ ও নিষ্কলুষ হয় সেই পরিমাণ হারাম পথ তার জন্য বন্ধ করে দেন। বপরীত পক্ষে যে ব্যক্তি হারাম খাবার জন্য উঠে পড়ে লাগে এবং এ জন্য চেষ্টা-চরিত্র করতে থাকে, আল্লাহর হুকুমে সে হারাম খাবারই পায়। এরপর তার ভাগ্যে হালাল রুজি লিখে দেবার ক্ষমতা আর কারো থাকে না। অনুরূপভাবে এটাও একটা জাজ্জ্বল্যমান সত্য যে, এই দুনিয়ায় চিন্তা ও কর্মের সমস্ত পথ আল্লাহর ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অধীন। আল্লাহর হুকুম, অনুমতি ও তাওফীক তথা সুযোগ দান ছাড়া কোন একটি পথেও চলার ক্ষমতা মানুষের নেই। তবে কোন্ ব্যক্তি কোন পথে চলার অনুমতি পায় এবং কোন্ পথে চলার উপকরণ তার জন্য সংগ্রহ করে দেয়া হয় এটা পুরোপুরি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজের চাহিদা, প্রচেষ্টা ও সাধনার ওপর। যদি আল্লাহর সাথে তার মানসিক সংযোগ থাকে, সে সত্যানুসন্ধানী হয় এবং সাচ্চা নিয়তে আল্লাহর পথে চলার জন্য প্রচেষ্টা চালায় তাহলে আল্লাহ তাকে তারই অনুমতি ও সুযোগ দান করেন। তখন এ পথে চলার যাবতীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম তার আয়ত্তাধীন হয়ে যায়। বিপরীত পক্ষে যে ব্যক্তি গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা পছন্দ করে এবং ভুল পথে চলার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য হিদায়াতের সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই সমস্ত পথ তার জন্য খুলে দেয়া হয় যেগুলো সে নিজের জন্য বাছাই করে নিয়েছে। এহেন ব্যক্তিকে ভুল চিন্তা করার, ভুল কাজ করার ও ভুল পথে নিজের শক্তি-সামর্থ ব্যয় করা থেকে নিরস্ত রাখার ক্ষমতা কারো নেই। যে ব্যক্তি নিজেই তার ভাগ্যের সঠিক পথ হারিয়ে বসে এবং আল্লাহ যাকে সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত করেন, কেউ তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে এবং এই হারানো নেয়ামত খুঁজে দিতে পারে না।

১৭৪. নিজের দীনকে একান্তভাবে আল্লাহর জন্য করে নেয়ার অর্থ হচ্ছে, মানুষ আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য করবে না, একমাত্র আল্লাহর প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত হবে। তার সমস্ত আগ্রহ আকর্ষণ, প্রীতি-ভালোবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবেদিত হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন জিনিসকে যে কোন মুহূর্তে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হবে, এমন ধরনের কোন ভালোবাসা বা হৃদয়ের টান তার কোন জিনিসের প্রতি থাকবে না।

১৭৫. মূল আয়াতে 'শোকর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'শোকর' শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে নেয়ামতের স্বীকৃতি দেয়া ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এবং অনুগৃহীত হওয়া। এ ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ না হও এবং তার সাথে নিমকহারামী না করো বরং যথার্থই তার প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত থাকো, তাহলে আল্লাহ অনর্থক তোমাদের শাস্তি দেবেন না।

একজন অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক পদ্ধতি কি? হৃদয়ের সমগ্র অনুভূতি দিয়ে তার অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয়া, মুখে এই অনুভূতির স্বীকারোক্তি করা এবং নিজের কার্যকলাপের মাধ্যমে অনুগৃহীত হবার প্রমাণ পেশ করাই হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾ اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿١٤٩﴾

*মানুষ খারাপ কথা বলে বেড়াক, এটা আল্লাহ পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম করা হলে তার কথা স্বতন্ত্র। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন। (মজলুম অবস্থায় তোমাদের খারাপ কথা বলার অধিকার থাকলেও) যদি তোমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে সৎকাজ করে যাও অথবা কমপক্ষে অসৎকাজ থেকে বিরত থাকো, তাহলে আল্লাহও বড়ই ক্ষমা-গুণের অধিকারী। অথচ তিনি শাস্তি দেবার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।*[১৭৭]

সঠিক উপায়। এই তিনটি কাজের সমবেত রূপই হচ্ছে 'শোকর'। এই শোকরের দাবী হচ্ছে প্রথমত অনুগ্রহকে অনুগ্রহকারীর অবদান বলে স্বীকার করতে হবে। অনুগ্রহের শোকরগুজারী করার এবং নেয়ামতের স্বীকৃতি দেবার ক্ষেত্রে অনুগ্রহকারীর সাথে আর কাউকে শরীক করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, অনুগ্রহকারীর প্রতি প্রেম, প্রীতি, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের অনুভূতিতে নিজের হৃদয় ভরপুর থাকবে এবং অনুগ্রহকারীর বিরোধীদের প্রতি এ প্রসংগে বিন্দুমাত্র প্রীতি, আন্তরিকতা, আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক থাকবে না। তৃতীয়ত, কার্যত অনুগ্রহকারীর আনুগত্য করতে হবে, তার হুকুম মেনে চলতে হবে এবং তিনি যে নেয়ামতগুলো দান করেছেন সেগুলো তার মর্জীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না।

১৭৬. কুরআনের আয়াতে এখানে মূলত 'শাকির' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অনুবাদ করতে গিয়ে আমি 'বড়ই পুরস্কারদানকারী' শব্দ ব্যবহার করেছি। আল্লাহর তরফ থেকে যখন বান্দার প্রতি শোকর করার কথা বলা হয় তখন এর অর্থ হয় 'কাজের স্বীকৃতি দেয়া বা কদর করা, মূল্য দান করা ও মর্যাদা দেয়া।' আর যখন বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতি শোকর করার কথা বলা হয় তখন এর অর্থ হয়, নেয়ামতের স্বীকৃতি দান বা অনুগৃহীত হবার কথা প্রকাশ করা। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার শোকরিয়া আদায় করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ বান্দার কাজের যথার্থ মূল্যদান করার ব্যাপারে কুণ্ঠিত নন। বান্দা তাঁর পথে যে ধরনের যতটুক কাজ করে আল্লাহ তার কদর করেন, তার যথার্থ মূল্য দেন। বান্দার কোন কাজ, পারিশ্রমিক ও পুরস্কার লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে না। বরং তিনি মুক্তহস্তে তার প্রত্যেকটি কাজের তার প্রাপ্যের চাইতে অনেক বেশী প্রতিদান দেন। মানুষের অবস্থা হচ্ছে, মানুষ যা কিছু কাজ করে তার প্রকৃত মূল্যের চাইতে কম মূল্য দেয় আর যা কিছু করে না সে সম্পর্কে কঠোরভাবে পাকড়াও করে। বিপরীত পক্ষে আল্লাহর অবস্থা হচ্ছে, মানুষ যে কাজ করেনি সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত কোমল, উদার ও উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করেন। আর যে কাজ সে করেছে তার মূল্য তার চাইতে অনেক বেশী দেন, যা তার প্রকৃতপক্ষে পাওয়া উচিত।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾

*যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের সাথে কুফরী করে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে আমরা কাউকে মানবো ও কাউকে মানবো না আর কুফর ও ঈমানের মাঝখানে একটি পথ বের করতে চায়, তারা সবাই আসলে কট্টর কাফের।[১৭৮] আর এহেন কাফেরদের জন্য আমি এমন শাস্তি তৈরী করে রেখেছি, যা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবে। বিপরীত পক্ষে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদেরকে মেনে নেয় এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না, তাদেরকে আমি অবশ্যি তার পুরস্কার দান করবো।[১৭৯] আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[১৮০]*

১৭৭. এ আয়াতে মুসলমানদের একটি অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ের নৈতিক শিক্ষা দান করা হয়েছে। সে সময় মুনাফিক, ইহুদী ও মূর্তি পূজারী সবাই একই সংগে সম্ভাব্য যাবতীয় উপায়ে ইসলামের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার ও ইসলাম গ্রহণকারীকে কষ্ট দেবার ও হয়রানী করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এই নতুন আন্দোলনটির বিরুদ্ধে এমন কোন নিকৃষ্টতম কৌশল ছিল না যা তারা অবলম্বন করেনি। কাজেই মুসলমানদের মধ্যে এর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্রোধের অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাদের মনে এই ধরনের অনুভূতির প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হতে দেখে আল্লাহ বলেন তোমাদের খারাপ কথা বলা ও অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করা আল্লাহর কাছে কোন পছন্দনীয় কাজ নয়। তোমরা মজলুম, এতে সন্দেহ নেই। আর মজলুম যদি জালেমের বিরুদ্ধে অশ্লীল কথা বলে, তাহলে তাদের সে অধিকার আছে। কিন্তু তবুও প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় ভাল কাজ করে যাওয়া ও খারাপ কাজ পরিহার করাই উত্তম। কারণ তোমাদের চরিত্র আল্লাহর চরিত্রের নিকটতর হওয়া উচিত। তোমরা যার নৈকট্য লাভ করতে চাও তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু। মারাত্মক অপরাধীদেরও তিনি রিযিক দান করেন এবং

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٥٣﴾

২২ রুকূ'

*এই আহ্লি কিতাবরা যদি আজ তোমার কাছে আকাশ থেকে তাদের জন্য কোন লিখন অবতীর্ণ করার দাবী করে থাকে,[১৮১] তাহলে ইতিপূর্বে তারা এর চাইতেও বড় ধৃষ্ঠতাপূর্ণ দাবী মূসার কাছে করেছিল। তারা তো তাকে বলেছিল, আল্লাহকে প্রকাশ্যে আমাদের দেখিয়ে দাও। তাদের এই সীমালংঘনের কারণে অকস্মাৎ তাদের ওপর বিদ্যুত আপতিত হয়েছিল।[১৮২] তারপর সুস্পষ্ট নিশানীসমূহ দেখার পরও তারা বাছুরকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছিল।[১৮৩] এরপরও আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছি। আমি মূসাকে সুস্পষ্ট ফরমান দিয়েছি।*

বড় বড় পাপ ও ত্রুটি-বিচ্যুতিও তিনি ক্ষমা করে দেন। কাজেই তাঁর নিকটতর হবার জন্য তোমরাও উচ্চ মনোবল, বুলন্দ হিম্মত ও উদার হৃদয়ের অধিকারী হও।

১৭৮. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে মানে না এবং তাঁর রসূলদেরকেও মানে না আবার যারা আল্লাহকে মানে কিন্তু রসূলদেরকে মানে না অথবা রসূলকে মানে কিন্তু আর কাউকে মানে না তারা সবাই কাফের। কাফের হবার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাদের কারো কাফের হবার ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহও নেই।

১৭৯. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে নিজেদের একমাত্র মাবুদ ও মালিক বলে স্বীকার করে নেয় এবং তার প্রেরিত সমস্ত নবীর আনুগত্য স্বীকার করে একমাত্র তারাই নিজেদের কাজের প্রতিদান লাভ করার অধিকার রাখে। তারা যে পর্যায়ের সৎকাজ করবে সেই পর্যায়ের প্রতিদান পাবে। আর যারা আল্লাহকে কোন প্রকার অংশীদারবিহীন মাবুদ ও রব হিসেবে মেনে নেয়নি অথবা যারা আল্লাহর প্রতিনিধিদের মধ্যে কাউকে মেনে নেয়ার ও কাউকে প্রত্যাখ্যান করার বিদ্রোহাত্মক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছে, তাদের কোন কাজের প্রতিদান দেবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ আল্লাহর দৃষ্টিতে এই ধরনের লোকদের কোন কাজের আই-নগত মূল্য নেই।

১৮০. অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর ঈমান আনবে তাদের হিসেব নেবার ব্যাপারে আল্লাহ মোটেই কড়াকড়ি করবেন না। বরং তাদের ব্যাপারে কোমলতা ও ক্ষমার নীতি অবলম্বন করবেন।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾

*এবং তূর পাহাড় তাদের ওপর উঠিয়ে তাদের থেকে (এই ফরমানের আনুগত্যের) অংগীকার নিয়েছি।[১৮৪] আমি তাদেরকে হুকুম দিয়েছি, সিজ্‌দানত হয়ে দরজার মধ্যে প্রবেশ করো।[১৮৫] আমি তাদেরকে বলেছি, শনিবারের বিধান লংঘন করো না এবং এর সপক্ষে তাদের থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছি।[১৮৬] শেষ পর্যন্ত তাদের অংগীকার ভংগের জন্য, আল্লাহর আয়াতের ওপর মিথ্যা আরোপ করার জন্য, নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এবং 'আমাদের দিল আবরণের মধ্যে সুরক্ষিত'[১৮৭] তাদের এই উক্তির জন্য (তারা অভিশপ্ত হয়েছিল)। অথচ[১৮৮] মূলত তাদের বাতিল পরস্তির জন্য আল্লাহ তাদের দিলের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এ জন্য তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে।*

১৮১. মদীনার ইহুদীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অদ্ভূত রকমের দাবী দাওয়া পেশ করতো। তাদের এই দাবীগুলোর মধ্যে একটি ছিল ঃ যতক্ষণ আমাদের চোখের সামনে একটি লিখিত কিতাব আকাশ থেকে নাযিল না হয় অথবা আমাদের প্রত্যেকের নামে ওপর থেকে এই মর্মে একটি লিখন না আসে যে, "মুহাম্মাদ আমার রসূল, তার ওপর তোমরা ঈমান আনো" ততক্ষণ আমরা আপনার রিসালাত মেনে নিতে প্রস্তুত নই।

১৮২. এখানে কোন ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইহুদীদের অপরাধের একটি সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি পেশ করা, তাই তাদের জাতীয় ইতিহাসের কতিপয় সুস্পষ্ট ঘটনার দিকে হালকাভাবে ইংগিত করা হয়েছে। এ আয়াতে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তা ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ৫৫নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে। (সূরা বাকারা ৭১ নম্বর টীকা দেখুন)।

১৮৩. 'সুস্পষ্ট নিশানীসমূহ' বলতে হযরত মূসা আলাইহিস সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে নিয়ে ফেরাউনের সাগরে নিমজ্জিত হওয়া ও বনী ইসরাঈলদের মিসর ছেড়ে বের হয়ে আসা পর্যন্ত একের পর এক যেসব নিশানী তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে সেগুলো

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا
الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ
وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا
لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾

*তারপর[১৮৯] তাদের নিজেদের কুফরীর মধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে মারয়ামের ওপর গুরুতর অপবাদ লাগাবার জন্য[১৯০] এবং তাদের 'আমরা আল্লাহর রসূল মারয়াম পুত্র ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করেছি'[১৯১] এই উক্তির জন্য (তারা অভিশপ্ত হয়েছিল)। অথচ[১৯২] প্রকৃতপক্ষে তারা তাকে হত্যাও করেনি এবং শূলেও চড়ায়নি বরং ব্যাপারটিকে তাদের জন্য সন্দিগ্ধ করে দেয়া হয়েছে।[১৯৩] আর যারা এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছে তারাও আসলে সন্দেহের মধ্যে অবস্থান করছে। তাদের কাছে এ সম্পর্কিত কোন জ্ঞান নেই, আছে নিছক আন্দাজ-অনুমানের অন্ধ অনুসৃতি।[১৯৪] নিসন্দেহে তারা ঈসা মসীহকে হত্যা করেনি।*

বুঝানো হয়েছে। বলা বাহুল্য কোন গো-বৎস মিসর সাম্রাজ্যের বিপুল শক্তিশালী নখর থেকে বনী ইসরাঈলকে রক্ষা করেনি বরং তাদের রক্ষা করেছিলেন আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজেই। কিন্তু বনী ইসরাঈল জাতির বাতিল প্রীতি এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যার ফলে আল্লাহর কুদরাত ও তাঁর অনুগ্রহের সুস্পষ্ট নিশানীসমূহ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জেনে নেবার পরও তারা নিজেদের প্রতি অনুগ্রহশীল আল্লাহর সামনে শির নত না করে একটি কৃত্রিম হাতে গড়া গো-বৎসের মূর্তির সামনে মাথা নত করে।

১৮৪. 'সুস্পষ্ট ফরমান' বলতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে কাঠের তখতির ওপর যে বিধান লিখে দেয়া হয়েছিল তাই বুঝানো হয়েছে। সামনের দিকে সূরা আরাফের ১৭ রুকূ'তে এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর 'প্রতিশ্রুতি' বলতে সেই জোরদার শপথকে বুঝানো হয়েছে যা তূর পাহাড়ের পাদদেশে বনী ইসরাঈলদের প্রতিনিধিদের থেকে নেয়া হয়েছিল। সূরা বাকারার ৬৩ আয়াতে ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা এসে গেছে এবং আরাফের ১৭১ আয়াতে আবার এর উল্লেখ আসবে।

১৮৫. সূরা বাকারার ৫৮-৫৯ আয়াত ও ৭৫ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮৬. সূরা বাকারার ৬৫ আয়াত এবং ৮২ ও ৮৩ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮৭. সূরা বাকারার ৮৮ আয়াতে ইহুদীদের এই বক্তব্যটির দিকে ইংগিত করা হয়েছে। আসলে দুনিয়ার সমস্ত বাতিল পূজারী জাহেলদের মতো এরাও এই মর্মে গর্ব করতো যে, নিজেদের বাপ-দাদাদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তারা যে সমস্ত চিন্তাধারা,

বংশ-প্রীতি, গোত্র-প্রীতি, রীতি-নীতি, রসম-রেওয়াজ লাভ করেছে সেসবের ওপর তাদের আকীদা-বিশ্বাস এতো বেশী পাকাপোক্ত হয়ে গেছে যে, কোনক্রমেই তাদেরকে সেসব থেকে সরানো যাবে না। যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম্বররা এসে তাদের বুঝাবার চেষ্টা করেছেন তখনই তারা তাদের এই একই জবাব দিয়েছেন ঃ তোমরা যে কোন যুক্তি-প্রমাণ, যে কোন নিদর্শন আনো না কেন আমরা তোমাদের কোন কথায় প্রভাবিত হবো না। এ পর্যন্ত আমরা যা কিছু মেনে এসেছি ও যা কিছু করে এসেছি এখনো তাই মানবো ও তাই করে যেতে থাকবো। (সূরা বাকারার ৯৪ নম্বর টীকা দেখুন)।

১৮৮. এটি প্রসংগক্রমে আগত একটি বিচ্ছিন্ন বাক্য।

১৮৯. এ বাক্যটি মূল ভাষণের ধারাবাহিক বিবরণীর সাথে সংশ্লিষ্ট।

১৯০. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে আসলে ইহুদী জাতির মধ্যে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। বরং যেদিন তার জন্ম হয়েছিল সেদিনই আল্লাহ সমগ্র জাতিকে এই মর্মে সাক্ষী বানিয়েছিলেন যে, এটি একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিশু। তাঁর জন্ম কোন নৈতিক অপরাধের নয় বরং একটি মু'জিযার ফলশ্রুতি। যখন বনী ইসরাঈলের সবচাইতে ভদ্র, শরীফ ও খ্যাতনামা ধর্মীয় পরিবারের একটি কুমারী মেয়ে একটি শিশুপুত্র কোলে নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং জাতির ছোট বড় শত শত হাজার হাজার লোক তার ঘরে ভিড় জমালো, তখন কুমারী মেয়েটি তাদের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নীরবে নবজাত সন্তানের দিকে অংগুলিনির্দেশ করলেন। অর্থাৎ এই নবজাতকই তোমাদের সব প্রশ্নের জবাব দেবে। লোকেরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ একে আমরা কি জিজ্ঞেস করবো, এতো দোলনায় শুয়ে আছে? কিন্তু হঠাৎ শিশুটির বোল ফুটলো এবং সে সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ কন্ঠে বলে উঠলো ঃ

اِنِّى عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا

"আমি আল্লাহর বান্দা, আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী বানিয়েছেন।"

(সূরা মারয়াম, ২য় রুকূ')

এভাবে ঈসা মসীহ আলাইহিস সালামের জন্ম সম্পর্কে যে সংশয় জমে ওঠার সম্ভাবনা ছিল আল্লাহ নিজেই তার মূলোৎপাটন করেন। এ জন্য হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত কেউ কোন দিন হযরত মারয়ামের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনেনি এবং হযরত ঈসাকে অবৈধ সন্তানও বলেনি। কিন্তু তিরিশ বছর বয়স হবার পর যখন তিনি নবুয়াতের কাজের সূচনা করলেন এবং যাবতীয় অসৎকাজের জন্য ইহুদীদের তিরস্কার করতে শুরু করলেন, তাদের আলেম ও ফকীহদের রিয়াকারীর সমালোচনা করতে থাকলেন তাদের সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষকে তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক অবনতির জন্য সতর্ক করতে লাগলেন এবং আল্লাহর দীনকে বাস্তবে কায়েম করার জন্য নিজের জাতিকে সব রকমের ত্যাগ স্বীকার করার ও সব ক্ষেত্রে শয়তানি শক্তির সাথে লড়াই করার আহবান জানালেন, তখন এই নির্লজ্জ অপরাধীরা সত্য ও সততার কন্ঠরোধ করার জন্য সব রকমের নিকৃষ্টতম অস্ত্র ব্যবহার করতে এগিয়ে এলো। তখন তারা এমন সব কথা বলতে থাকলো যা তারা তিরিশ বছর

পর্যন্ত বলেনি। অর্থাৎ মারয়াম আলাইহাস সালাম (নাউযুবিল্লাহ) একজন ব্যভিচারিনী এবং ঈসা ইবনে মারয়াম তার অবৈধ সন্তান। অথচ এই জালেমরা নিশ্চিতভাবেই জানতো, এই মাতা ও পুত্র উভয়ই এই ধরনের কলুষতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। কাজেই তাদের মনে যথার্থই এ ধরনের কোন সন্দেহ পুঞ্জিভূত ছিল না যার ভিত্তিতে তারা এই দোষারোপ করেছিল। এটা ছিল তাদের একটা স্বেচ্ছাকৃত দোষারোপ। জেনে বুঝে নিছক হকের বিরোধিতা করার জন্য তারা তাদের মাতা পুত্রের বিরুদ্ধে এই মিথ্যাটি তৈরী করেছিল। তাই আল্লাহ একে জুলুম ও মিথ্যার পরিবর্তে কুফরী গণ্য করেছেন। কারণ এই দোষারোপের মাধ্যমে তারা আসলে আল্লাহর দীনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল। একজন নিষ্পাপ ও নিরপরাধ মহিলার বিরুদ্ধে দোষারোপ করা তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল না।

১৯১. অর্থাৎ তাদের অপরাধ করার দুঃসাহস এতই বেড়ে গিয়েছিল যার ফলে তারা আল্লাহর রসূলকে রসূল জেনেও তাকে হত্যা করার পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং গর্ব করে বলেছিল ঃ আমরা আল্লাহর রসূলকে হত্যা করেছি। ওপরে আমরা দোলনার ঘটনার যে বর্ণনা দিয়েছি তা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইহুদীদের জন্য ঈসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াতে সন্দেহ করার কোন অবকাশই ছিল না। এ ছাড়াও তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কাছ থেকে যে উজ্জ্বল নিশানীগুলো প্রত্যক্ষ করেছিল (সূরা আলে ইমরানের ৫ম রুকূ’তে ইতিপূর্বে এটি আলোচিত হয়েছে) তা থেকে তিনি যে আল্লাহর রসূল এ বিষয়টি সকল প্রকার সন্দেহের উর্ধে চলে গিয়েছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তারা তাঁর সাথে যা কিছু করেছিল তা কোন ভুল বুঝাবুঝির ভিত্তিতে করেনি বরং তারা ভালোভাবেই জানতো যে, এই অপরাধ তারা এমন এক ব্যক্তির সাথে করছে যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম্বর হয়ে এসেছেন।

কোন জাতি এক ব্যক্তিকে নবী বলে জানার ও মেনে নেয়ার পরও তাকে হত্যা করেছে, আপাতঃ দৃষ্টিতে এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার বলে মনে হয়। কিন্তু দুনিয়ার বিকৃত জাতিদের রীতিনীতি, কাজ–কারবার এমনি বিস্ময়করই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি তাদের অন্যায় ও পাপ কাজের সমালোচনা করে এবং তাদের অবৈধ কাজে বাধা দেয়, এমন কোন ব্যক্তিকে তারা নিজেদের মধ্যে বরদাশ্‌ত করতে পারে না। নবী হলেও এই ধরনের লোকেরা হামেশা অসৎ, দুশ্চরিত্র ও পাপাচারী জাতিদের হাতে কারাযন্ত্রণা ও মৃত্যুদণ্ড ভোগ করে এসেছেন। তালমুদে লিখিত হয়েছে ঃ বখতে নসর বায়তুল মাক্‌দিস জয় করে সুলাইমানী হাইকেলে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলেন। যে স্থানে কুরবানী করা হয় সে স্থানের ঠিক সামনে দেয়ালে এক জায়গায় তিনি একটি তীরের নিশানী দেখলেন। তিনি ইহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের নিশানী? ইহুদীরা জবাব দিল, “এখানে আমরা যাকারিয়া নবীকে হত্যা করেছিলাম। তিনি আমাদের অসৎকাজের জন্য তিরস্কার করতেন। অবশেষে তার তিরস্কারে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা তাকে হত্যা করেছি।” বাইবেলে ইয়ারমিয়াহ নবী সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ বনী ইসরাইলদের অসৎকর্মসীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর হযরত ইয়ারমিয়াহ তাদের এই মর্মে সতর্ক করে দিলেন যে, এসব বদ কাজের প্রতিফল হিসেবে আল্লাহ অন্য জাতিদের হাতে তোমাদের ধ্বংস করে দেবেন। এর জবাবে তারা তার বিরুদ্ধে দোষারোপ করলো ঃ “এই ব্যক্তি

'কালদানী' জাতির সাথে হাত মিলিয়েছে, তাদের সাথে যোগসাজশ করেছে। এই ব্যক্তি জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।" এই অভিযোগে তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এমনকি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শূলে চড়াবার ঘটনার মাত্র দুই আড়াই বছর পূর্বে হযরত ইয়াহ্ইয়ার (আ) ব্যাপারটি ঘটে গিয়েছিল। ইহুদীরা সাধারণভাবে তাকে নবী বলে জানতো। অন্তত তাকে জাতির সবচাইতে সৎলোক হিসেবে মানতো। কিন্তু যখন তিনি হিরোডিয়াসের (ইহুদী রাষ্ট্র প্রধান) দরবারের অন্যায় ও অসৎকাজের সমালোচনা করলেন তখন আর তাকে বরদাশত করা হলো না। প্রথমে তাকে কারারুদ্ধ করা হলো তারপর রাষ্ট্র প্রধানের প্রেমিকার দাবী অনুযায়ী তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হলো। ইহুদী জাতির এই অতীত রেকর্ডগুলো পর্যবেক্ষণ করার পর একথা মোটেই বিস্ময়কর মনে হয় না যে, তাদের ধারণা মতে তারা হযরত ঈসা মসীহকে (আ) শূলে চড়াবার পর বুক ঠুকে একথা বলেছে ঃ "আমরা আল্লাহর রসূলকে হত্যা করেছি।"

১৯২. এটি আবার প্রসংগক্রমে আগত একটি অন্তরবর্তী বিচ্ছিন্ন বাক্য।

১৯৩. এ আয়াতটি দ্ব্যর্থহীনভাবে একথা প্রমাণ করে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে শূলে চড়াবার আগেই উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। আর ঈসা মসীহ (আ) শূলবিদ্ধ হয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন বলে খৃষ্টান ও ইহুদীরা যে ধারণা পোষণ করে তা নিছক একটি ভুল বুঝাবুঝি ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআন ও বাইবেলের তুলনামূলক অধ্যয়ন করে আমরা জানতে পারি, সম্ভবত পীলাতুসের আদালতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকেই পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু যখন সে তার মৃত্যুদণ্ডের রায় শুনিয়ে দিল এবং ইহুদীরা ঈসা মসীহের মতো পূণ্যাত্মার প্রাণের চাইতে একজন দস্যুর প্রাণকে অধিক মূল্যবান গণ্য করে নিজেদের সত্য বিরোধিতা ও বাতিল প্রীতির চূড়ান্ত প্রমাণটিও পেশ করে দিলো, তখন কোন এক সময় আল্লাহ তাকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। পরে ইহুদীরা যে ব্যক্তিকে শূলে চড়ালো সে ঈসা ইবনে মারয়াম ছিল না। সে ছিল অন্য কোন ব্যক্তি। কোন অজ্ঞাত কারণে তারা তাকে ঈসা ইবনে মারয়াম মনে করে নিয়েছিল। তবুও এতে তাদের অপরাধের পরিমাণ হ্রাস হবে না। কারণ যাকে তারা কাঁটার টুপি পরিয়েছিল, যার মুখে থু থু নিক্ষেপ করেছিল এবং যাকে লাঞ্ছনা সহকারে শূলে চড়িয়েছিল তাকে তো তারা ঈসা ইবনে মারয়ামই মনে করছিল। ব্যাপারটি কিভাবে তাদের কাছে সংশয়িত হয়ে গিয়েছিল তা জানার কোন উপায় আমাদের আয়ত্বে নেই। যেহেতু এই পর্যায়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহের কোন উৎস আমাদের জানা নেই তাই ঈসা ইবনে মারয়াম ইহুদীদের কবলমুক্ত হয়ে যাওয়ার পরও তারা ঈসা ইবনে মারয়ামকেই শূলবিদ্ধ করেছে বলে যে সংশয় পোষণ করছিল নিছক ধারণা, আন্দাজ–অনুমান ও জনশ্রুতির ভিত্তিতে তার স্বরূপ নির্ধারণ করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়।

১৯৪. মতবিরোধকারী বলে এখানে খৃষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। ঈসা আলাইহিস সালামকে শূলে চড়াবার ব্যাপারে তাদের কোন একটি সর্বসম্মত মত বা বক্তব্য নেই। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে বহু মতের প্রচলন রয়েছে। তাদের এই অসংখ্য মতই প্রমাণ করে যে, আসল ব্যাপারটি তাদের কাছেও সংশয়পূর্ণই রয়ে গেছে। তাদের একদল বলে ঃ যে ব্যক্তিকে শূলে চড়ানো হয়েছিল সে ঈসা মসীহ ছিল না। ঈসার চেহারায় সে ছিল অন্য এক ব্যক্তি। ইহুদী ও রোমীয় সৈন্যরা তাকে লাঞ্ছনার সাথে শূলে চড়াচ্ছিল। আর ঈসা মসীহ

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٥٨﴾ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿١٥٩﴾ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾

*বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন।[১৯৫] আল্লাহ জবরদস্ত শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাময়। আর আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে এমন একজনও হবে না। যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার ওপর ঈমান আনবে না,[১৯৬] এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে।[১৯৭] মোটকথা[১৯৮] এই ইহুদী মতাবলম্বীদের এহেন জুলুম নীতির জন্য, তাদের মানুষকে ব্যাপকভাবে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার জন্য[১৯৯]*

সেখানে কোনো এক স্থানে দাঁড়িয়ে তাদের নির্বুদ্ধিতায় হাসছিলেন। অন্য এক দল বলে ঃ শূলদণ্ডে ঈসা মসীহকেই চড়ানো হয়েছিলো। কিন্তু শূলদণ্ডে তার মৃত্যু হয়নি বরং নামিয়ে নেয়ার পর তার মধ্যে প্রাণ ছিল। আর একদল বলে ঃ তিনি শূলে মৃত্যুবরণ করেছিলেন আবার প্রাণ লাভ করেছিলেন। এরপর কমপক্ষে দশবার নিজের বিভিন্ন 'হাওয়ারী'দের সাথে সাক্ষাত করে তাদের সাথে আলাপ করেছিলেন। চতুর্থ আর একদল বলে ঃ শূলের ওপর ঈসার মানবিক দেহের মৃত্যু ঘটেছিলো এবং তাকে দাফনও করা হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে খোদায়ীর যে আত্মা ছিল তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। পঞ্চম দলটি বলে ঃ মরার পর ঈসা মসীহ আলাইহিস সালাম এই জড়দেহসহ জীবিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং সশরীরেই তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, আসল সত্য ঘটনাটি তাদের জানা থাকলে সে সম্পর্কে এতগুলো পরস্পর বিরোধী কথা ও মত তাদের মধ্যে প্রচলিত থাকতো না।

১৯৫. এ প্রসংগে এটিই হচ্ছে প্রকৃত সত্য। আল্লাহ্ সুস্পষ্ট ভাষায় এটি ব্যক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে দৃঢ়তা সহকারে যে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তা কেবল এতটুকু যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করতে ইহুদীরা কামিয়াব হয়নি এবং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। এখন প্রশ্ন ওঠে কিভাবে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। কুরআনে এর কোন বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি। কুরআন যেমন একথা বলে না যে, আল্লাহ তাকে এই জড়দেহ ও আত্মাসহকারে পৃথিবী থেকে তুলে নিয়ে আকাশ রাজ্যের কোথাও রেখে দিয়েছেন আবার তেমনি একথাও বলে না যে, পৃথিবীতে তার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছিল কেবল তাঁর রূহটি ওপরে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। তাই কুরআনের ভিত্তিতে এর কোন একটি দিককে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ ও অন্য দিকটিকে চূড়ান্তভাবে বর্জন করা যেতে পারে না। কিন্তু কুরআনের বর্ণনাভংগী সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে একথা

সুস্পষ্ট অনুভূত হয় যে, উঠিয়ে নেবার ধরন ও অবস্থা যাই হোক না কেন ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহ অবশ্যি এমন কিছু ব্যাপার করে থাকবেন যা নিসন্দেহে অস্বাভাবিক পর্যায়ের। তিনটি বিষয় থেকে এই অস্বাভাবিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এক ঃ ঈসা আলাইহিস সালামকে এই জড় দেহ ও প্রাণ সহকারে উঠিয়ে নেবার ধারণা খৃষ্টানদের মধ্যে আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। আর খৃষ্টানদের একটি বড় দল যে হযরত ঈসাকে 'খোদা' বলে ধারণা করতো এটিই ছিল তার একটি অন্যতম কারণ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শুধু যে এর প্রতিবাদই জানায়নি তাই নয় বরং খৃষ্টানরা এ ঘটনাটির জন্য যে 'উঠিয়ে নেয়া' (Ascension) শব্দটি ব্যবহার করে থাকে কুরআনেও হুবহু সেই একই শব্দ ব্যবহার করেছে। কোন একটি চিন্তার প্রতিবাদ করতে চেয়েও তার জন্য এমন ভাষা ব্যবহার করা যা ঐ চিন্তাকে আরো শক্তিশালী করে—এটা কুরআনের মতো দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য উপস্থাপনকারী কিতাবের রীতি ও মর্যাদার সাথে মোটেই খাপ খায় না।

দুই ঃ যদি ঈসা আলাইহিস সালামকে উঠিয়ে নেয়া তেমন ধরনের কোন উঠিয়ে নেয়া হতো যেমন প্রত্যেক মৃত্যুবরণকারীকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়ে থাকে অথবা এই উঠিয়ে নেয়ার অর্থ যদি শুধু সম্মান ও মর্যাদার উন্নতি হতো যেমন হযরত ইদরীস আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (আর তাঁকে আমি উচ্চমর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম) তাহলে এখানে কথাটা কখনও এভাবে বর্ণনা করা হতো না। বরং নিম্নোক্ত শব্দাবলী সহযোগে কথাটা বলা অধিক যুক্তিযুক্ত হতো। যেমন ঃ "নিসন্দেহে তারা ঈসাকে হত্যা করেনি বরং আল্লাহ তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। তারপর তাকে স্বাভাবিক মৃত্যুদান করেছেন। ইহুদীরা তাকে হত্যা করতে চাইছিল কিন্তু আল্লাহ তাকে উন্নত মর্যাদা দান করেছেন।"

তিন ঃ যদি এই উঠিয়ে নেয়াটা যেমন তেমন মামুলি ধরনের উঠিয়ে নেয়া হতো, যেমন প্রচলিত নিয়মে কোন মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা বলে থাকি ঃ "আল্লাহ তায়ালা তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন," তাহলে এর উল্লেখ করার পর আবার "আল্লাহ মহাশক্তিধর ও জ্ঞানী" এই বাক্যটি বলা সম্পূর্ণ অসমিচীন ও অপ্রাসংগিক হয়ে পড়তো। যে ঘটনায় আল্লাহর জবরদস্ত শক্তি ও জ্ঞানের অস্বাভাবিক প্রকাশ ঘটে একমাত্র তেমন কোন ঘটনার পরই এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ করা উপযোগী ও সমিচীন হতে পারে।

এর জবাবে কুরআন থেকে কোন যুক্তি প্রমাণ পেশ করতে চাইলে বড় জোর এতটুকু বলা যায় যে, সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ مُتَوَفِّيكَ শব্দটি ব্যবহার করেছেন (৫৫ আয়াত)। কিন্তু সেখানে ৫১ নং টীকায় আমরা একথা পরিকারভাবে উল্লেখ করেছি যে, স্বাভাবিক মৃত্যু অর্থে এ শব্দটির ব্যবহার তেমন সুস্পষ্ট নয়। বরং এ শব্দটি থেকে 'প্রাণ হরণ' এবং 'প্রাণ ও দেহ উভয়টি হরণ' করা অর্থ হতে পারে। কাজেই আমরা ওপরে যে সমস্ত কারণ ও নিদর্শন বর্ণনা করেছি সেগুলো নাকচ করে দেবার জন্য এটি মোটেই যথেষ্ট নয়। ঈসা আলাইহিস সালাম স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন বলে যারা দাবী জানিয়ে আসছে তারা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, প্রাণ ও দেহ হরণ করার ব্যাপারে تَوَفِّى শব্দটির ব্যবহারের আর কোন নজির আছে কি? কিন্তু মানব জাতির সমগ্র ইতিহাসে প্রাণ ও দেহ হরণ করার ব্যাপারটি যখন মাত্র একবারই সংঘটিত হয়েছে তখন এই অর্থে মানুষের ভাষায় এ

শব্দটির ব্যবহারের নজির দাবী করা একেবারেই অর্থহীন। ভাষার মূল আভিধানিক পরিসরে এ শব্দটির এ ধরনের অর্থ ব্যবহারের অবকাশ আছে কি না, এখানে কেবল এতটুকুই দেখা দরকার। যদি অবকাশ থেকে থাকে তাহলে একথা মানতে হবে যে, কুরআন সশরীরে উঠিয়ে নেয়ার আকীদার দ্ব্যর্থহীন প্রতিবাদ জানাবার পরিবর্তে এ শব্দটি ব্যবহার করে এই আকীদাটির সহায়ক কারণ ও নিদর্শনগুলোর সংখ্যা আরো একটি বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যথায় যেখানে পূর্ব থেকেই সশরীরে উঠিয়ে নেবার আকীদা বর্তমান ছিল এবং যার ফলে ঈসাকে খোদায়ী শক্তির অধিকারী মনে করার আকীদা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, সেখানে 'মৃত্যু'–এর ন্যায় সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন শব্দ ব্যবহার না করে 'ওফাত'–এর ন্যায় দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করার কোন কারণ ছিল না।

অসংখ্য হাদীসও সশরীরে উঠিয়ে নেবার আকীদাকে আরো শক্তিশালী করেছে। এ হাদীসগুলোতে হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সালামের পুনর্বার দুনিয়ায় আগমন ও দাজ্জালকে হত্যা করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। (সূরা আহযাবের তাফসীরের পরিশিষ্টে আমি এ ধরনের সমস্ত হাদীস একত্র করে দিয়েছি।) এগুলো থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় বার আগমনের ব্যাপারটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। মৃত্যুর পর তিনি পুনর্বার জীবিত হয়ে এই মরজগতে ফিরে আসবেন অথবা আল্লাহর এই বিশাল সাম্রাজ্যের কোথাও তিনি আছেন এবং সেখান থেকে আবার এই দুনিয়ায় ফিরে আসবেন—এ দু'টির মধ্যে কোন্‌টি এখন অধিকতর যুক্তিসংগত বলে মনে হয়? যে কোন বিবেকবান ব্যক্তি নিজেই এর মীমাংসা করতে পারেন।

১৯৬. এ বাক্যটির দু'টি অর্থ করা হয়েছে। দু'টি অর্থের সমান অবকাশও এখানে রয়েছে। এর একটি অর্থ আমরা আয়াতের তরজমায় বর্ণনা করেছি। আর এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে : "আহলে কিতাবের মধ্যে এমন একজনও নেই যে মৃত্যুর পূর্বে ঈসার ওপর ঈমান আনবে না।" আহলে কিতাব অর্থ হচ্ছে ইহুদী। এর অর্থ খৃষ্টানও হতে পারে। প্রথম অর্থটির পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যটির মূল বক্তব্য হবে : ঈসার যখন স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটবে সে সময় যত আহলে কিতাব থাকবে তারা সবাই তাঁর ওপর (অর্থাৎ তার রিসালাতের ওপর) ঈমান আনবে। দ্বিতীয় অর্থটির দৃষ্টিতে এর মূল বক্তব্য হবে : মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত আহলে কিতাবের সামনে ঈসা আলাইহিস সালামের রিসালাতের সত্যতা সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং তারা ঈসার (আ) ওপর ঈমান আনে। কিন্তু তারা এমন এক সময় এ ঈমান আনে যখন ঈমান আনা ফলপ্রসূ হতে পারে না। এই দু'টি অর্থই বিপুল সংখ্যক সাহাবা, তাবেঈ ও প্রধান মুফাস্‌সিরদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে এর সঠিক অর্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন।

১৯৭. অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে এবং তিনি যে বাণী এনেছিলেন তার সাথে যে ব্যবহার করেছে তার ওপর তিনি আল্লাহর দরবারে সাক্ষ দেবেন। এই সাক্ষ্যের ওপর কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সূরা মায়েদার শেষ রুকূ'তে।

১৯৮. মধ্যবর্তী প্রাসংগিক বিচ্ছিন্ন বাক্য খতম হবার পর এখান থেকে আবার পূর্বে বর্ণিত ভাষণের সিলসিলা শুরু হচ্ছে।

১৯৯. অর্থাৎ তারা কেবল নিজেরা আল্লাহর পথ থেকে সরে গিয়ে ক্ষান্ত হয়নি বরং এই সংগে তারা এতবড় দুঃসাহসিক অপরাধ প্রবণতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে যে, দুনিয়ায় আল্লাহর

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۭ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

*তাদের সুদ গ্রহণ করার জন্য যা গ্রহণ করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল[২০০] এবং অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য, আমি এমন অনেক পাক-পবিত্র জিনিস তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি, যা পূর্বে তাদের জন্য হালাল ছিল।[২০১] আর তাদের মধ্য থেকে যারা কাফের তাদের জন্য কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি।[২০২]*

বান্দাদের পথভ্রষ্ট করার জন্য যতগুলো আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে তাদের অধিকাংশের পেছনে ইহুদী মস্তিষ্ক ও ইহুদী পুঁজিকে সক্রিয় দেখা গেছে। হকের পথে ও সত্যের দিকে আহবান করার জন্য যে আন্দোলনই শুরু হয়েছে তার বিরুদ্ধে ইহুদীরাই সবচেয়ে বড় বাধার প্রাচীর দাঁড় করিয়েছে। অথচ এই দুর্ভাগা জাতিটির কাছে আল্লাহর কিতাব আছে এবং তারা নবীদের উত্তরাধিকারী। তাদের সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে কমিউনিষ্ট আন্দোলন। ইহুদী মস্তিষ্ক এ আন্দোলনটির স্রষ্টা। ইহুদী নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় এ আন্দোলন অগ্রগতি লাভ করেছে। আল্লাহকে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করে, প্রকাশ্যে আল্লাহর সাথে শত্রুতা করে এবং আল্লাহর আনুগত্য ব্যবস্থাকে মিটিয়ে দেবার বিঘোষিত সংকল্পের ভিত্তিতে সমগ্র মানবতার ইতিহাসে দুনিয়ার বুকে প্রথম খোদাদ্রোহী জীবন বিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাটি প্রতিষ্ঠার অপরাধও এই তথাকথিত আহলে কিতাব জাতিটির দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উম্মত এই ইহুদী জাতিই ছিল এর উদগাতা, প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। আধুনিক যুগে কমিউনিজমের পরে গোমরাহীর সবচেয়ে বড় খুঁটি ফ্রয়েডের দর্শন, মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই ফ্রয়েডও বনী ইসরাঈলেরই এক সন্তান।

২০০. তাওরাতে সুস্পষ্ট ভাষায় এ নির্দেশটি লিখিত রয়েছে ঃ

"যদি তুমি আমার লোকদের মধ্য থেকে যে তোমার কাছে থাকে এমন কোন অভাবীকে ঋণ দাও তাহলে তার সাথে ঋণদাতার ন্যায় ব্যবহার করো না। তার কাছ থেকে সুদও নিয়ো না। যদি তুমি কখনো নিজের প্রতিবেশীর কাপড় বন্ধকও রাখো তাহলে সূর্য ডোবার আগেই তাবটা তাকে ফেরত দাও। কারণ সেটিই তার একমাত্র পরার কাপড়। সেটিই তার শরীর ঢাকার জন্য একমাত্র পোশাক। তা না হলে সে কি গায়ে দিয়ে ঘুমাবে? কাজেই সে ফরিয়াদ করলে আমি তার কথা শুনবো। কারণ আমি করুণাময়।" (যাত্রা পুস্তক ২২ ঃ ২৫—২৭)

এ ছাড়াও তাওরাতের আরো কয়েক স্থানে সুদ হারাম হবার বিধান রয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই তাওরাতের প্রতি ঈমানের দাবীদার ইহুদী সমাজ আজকের দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় সুদখোর, সংকীর্ণমনা ও পাষাণ হৃদয় জাতি হিসেবে সর্বত্র পরিচিত এবং এসব ব্যাপারে তাদেরকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়ে থাকে।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾

*কিন্তু তাদের মধ্য থেকে যারা পাকাপোক্ত জ্ঞানের অধিকারী ও ঈমানদার তারা সবাই সেই শিক্ষার প্রতি ঈমান আনে, যা তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল।[২০৩] এ ধরনের ঈমানদার নিয়মিতভাবে নামায কায়েমকারী, যাকাত আদায়কারী এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী লোকদেরকে আমি অবশ্যি মহাপুরস্কার দান করবো।*

২০১. সামনের দিকে সূরা আনআমের ১৪৬ আয়াতে যে বিষয়বস্তুর আলোচনা আসছে এখানে সম্ভবত সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদের ওপর এমন সব প্রাণী হারাম করে দেয়া হয় যাদের নখর রয়েছে। গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের ওপর হারাম করে দেয়া হয়। এছাড়াও সম্ভবত ইহুদী ফিকাহ শাস্ত্রে অন্য যে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা ও কঠোরতার সন্ধান পাওয়া যায়, এখানে সেদিকেও ইশারা করা হয়েছে। কোন দলের জীবন যাপনের ক্ষেত্র সংকীর্ণ করে দেয়া আসলে তার জন্য একটি শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।–(বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন সূরা আন'আম, ১২২ নম্বর টীকা)

২০২. অর্থাৎ এ জাতির যেসব লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আনুগত্য পরিহার করে বিদ্রোহ ও অস্বীকৃতির পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ায় ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রাখা হয়েছে। দনিয়ায় যে ভীষণ শাস্তি তারা পেয়েছে ও পাচ্ছে তা আজ পর্যন্ত অন্য কোন জাতি পায়নি। দু' হাজার বছর হয়ে গেলো কিন্তু এখনো দুনিয়ার কোথাও তারা সম্মানজনক কোন ঠাঁই করতে পারেনি। দুনিয়ায় তাদের বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয়েছে। সর্বত্র তারা বিদেশী। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটি যুগও অতিক্রান্ত হয়নি যখন দুনিয়ার কোথাও না কোথাও তাদের লাঞ্ছিত ও বিধ্বস্ত হতে হয়নি। নিজেদের বিপুল ধনাঢ্যতা সত্ত্বেও কোথাও তাদের সম্মানের চোখে দেখা হয় না। আর সবচাইতে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন জাতির জন্ম হয় তারপর তারা খতম হয়ে যায় কিন্তু এ জাতিটির মৃত্যু হচ্ছে না। একে দুনিয়ায় তাদের لا يموت فيها ولا يحيى অর্থাৎ 'না জীবিত না মৃত'—জীবন্মৃত অবস্থার শাস্তি দেয়া হয়। এ জাতিটি যাতে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির জন্য একটি জীবন্ত শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত হয় এবং নিজের সুদীর্ঘ ইতিহাস থেকে এ শিক্ষাদান করতে থাকে যে, আল্লাহর কিতাব বগলে দাবিয়ে রেখে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উঁচু করার পরিণাম এমনিই হয়ে থাকে—এটিই হচ্ছে এ জাতিটিকে জীবন্মৃত অবস্থায় টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য। আর আখেরাতের আযাব হবে ইনশাআল্লাহ এর চাইতেও বেশী কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক। (এ আলোচনার পর ফিলিস্তিনের ইসরাঈল রাষ্ট্রটি

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾

২৩ রুকূ'

*হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার কাছে ঠিক তেমনিভাবে অহী পাঠিয়েছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে পাঠিয়ে ছিলাম।*[২০৪] *আমি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুব সন্তানদের কাছে এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের কাছে অহী পাঠিয়েছি। আমি দাউদকে যবূর দিয়েছি।*[২০৫] *এর পূর্বে যেসব নবীর কথা তোমাকে বলেছি তাদের কাছেও আমি অহী পাঠিয়েছি এবং যেসব নবীর কথা তোমাকে বলিনি তাদের কাছেও। আমি মূসার সাথে কথা বলেছি ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়।*[২০৬]

সম্পর্কে লোকদের মনে যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য আলে ইমরানের ১১২ আয়াত দেখুন)

২০৩. অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে যেসব লোক আসমানী কিতাবসমূহের যথার্থ শিক্ষা অবগত হয়েছে এবং সব ধরনের হিংসা বিদ্বেষ, জাহেলী জিদ–হঠধর্মিতা, বংশানুক্রমিক অন্ধ অনুসৃতি ও স্বার্থপূজা থেকে মুক্ত হয়ে আসমানী কিতাবসমূহ থেকে যে নিখাদ সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায় তাকে সাচ্চা দিলে আন্তরিকতা সহকারে মেনে নেয়, তাদের ভূমিকা হয় কাফের ও জালেম ইহুদীদের সাধারণ ভূমিকা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তারা এক নজরে অনুভব করে, পূর্ববর্তী নবীগণ যে দীনের শিক্ষা দিয়েছিলেন কুরআন তারই শিক্ষা দিচ্ছে। তাই তারা নিরপেক্ষ সত্যপ্রীতি সহকারে উভয়টির ওপর ঈমান আনে।

২০৪. এখানে যে কথা বলতে চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কোন নতুন জিনিস আনেননি, যা ইতিপূর্বে আর কেউ আনেননি। তিনি দাবী করছেন না যে, তিনিই এই প্রথমবার একটি নতুন জিনিস পেশ করছেন। বরং পূর্ববর্তী নবীগণ জ্ঞানের যে উৎসটি থেকে হিদায়াত লাভ করেছেন তিনিও হিদায়াত লাভ করেছেন সেই একই উৎস থেকে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণকারী। পয়গাম্বরগণ হামেশা যে সত্যের বাণী প্রচার করে এসেছেন তিনিও সেই একই সত্য প্রচার করেছেন।

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝ لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝

*এই সমস্ত রসূলকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল,[২০৭] যাতে তাদেরকে রসূল বানিয়ে পাঠাবার পর লোকদের কাছে আল্লাহর মোকাবিলায় কোন প্রমাণ না থাকে।[২০৮] আর আল্লাহ সর্বাবস্থায়ই প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। (লোকেরা চাইলে না মানতে পারে) কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ দেন, তিনি যা কিছু তোমাদের ওপর নাযিল করেছেন নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে নাযিল করেছেন এবং এর ওপর ফেরেশতারাও সাক্ষী, যদিও আল্লাহর সাক্ষী হওয়াই যথেষ্ট হয়।*

অহী অর্থ হচ্ছে ইশারা করা, মনের মধ্যে কোন কথা প্রক্ষিপ্ত করা, গোপনভাবে কোন কথা বলা এবং পয়গাম পাঠানো।

২০৫. বর্তমান বাইবেলের মধ্যে 'যাবুর' (গীতসংহিতা) নামে যে অধ্যায়টি পাওয়া যায় তার সবটুকুই দাউদ আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ যাবুর নয়। তার মধ্যে অন্যান্য লোকদের বহু কথা মিশিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সেগুলোকে তাদের রচয়িতাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। তবে যে সমস্ত বাণীতে (স্তোত্র) একথা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সেগুলো হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের, সেগুলোর মধ্যে যথার্থই সত্য বাণীর উজ্জ্বল আলো অনুভূত হয়। অনুরূপভাবে বাইবেলে 'আমসালে সুলাইমান' (হিতোপদেশ) নামে যে অধ্যায়টি রয়েছে, তাতেও ব্যাপক মিশ্রণ পাওয়া যায়। তার শেষ দু'টি অনুচ্ছেদ যে পরে সংযোজন করা হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবুও তার বৃহত্তর অংশ নির্ভুল ও সত্য মনে হয়। এই দু'টি অধ্যায়ের সাথে সাথে হযরত 'আইউব' (ইয়োব) আলাইহিস সালামের নামেও আর একটি অধ্যায় বাইবেলের অন্তরভুক্ত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে জ্ঞানের বহু অমূল্য তত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও সেটি পড়তে গিয়ে হযরত আইউবের সাথে তার সংশ্লিষ্ট করার ব্যাপারটি সত্য বলে বিশ্বাস করা যায় না। কারণ কুরআনেও এই অধ্যায়টির প্রথম দিকে হযরত আইউবের যে মহান সবরের প্রশংসা করা হয়েছে সমগ্র অধ্যায় ঠিক তার উলটো চিত্রই পেশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, হযরত আইউব তার সমগ্র বিপদকালে আল্লাহর বিরুদ্ধে সর্বক্ষণ অভিযোগ মুখর ছিলেন। এমনকি তার সহচর নাকি এই মর্মে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতেন যে, আল্লাহ জালেম নন; কিন্তু তিনি কোনক্রমেই তা মানতে প্রস্তুত হতেন না।

এসব সহীফা ছাড়াও বনী ইসরাঈলদের নবীদের আরো ১৭ খানি সহীফা বাইবেলে অন্তরভুক্ত হয়েছে। এগুলোর বেশীর ভাগ সঠিক বলে মনে হয়। বিশেষ করে ইয়াস'ঈয়াহ্

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا
بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ
لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ
وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ
بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

*যারা নিজেরাই এটা মানতে অস্বীকার করে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয় তারা নিসন্দেহে ভুল পথে অগ্রসর হয়ে সত্য থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। এভাবে যারা কুফরী ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করে এবং জুলুম-নিপীড়ন চালায়, আল্লাহ তাদেরকে কখনো মাফ করবেন না এবং তাদেরকে জাহান্নামের পথ ছাড়া আর কোন পথ দেখাবেন না, যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহর জন্য এটা কোন কঠিন কাজ নয়।*

*হে লোকেরা! এই রসূল তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হক নিয়ে এসেছে। কাজেই তোমরা ঈমান আনো তোমাদের জন্যই ভালো। আর যদি অস্বীকার করো, তাহলে জেনে রাখো, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর।[২০৯] আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি প্রজ্ঞাময়।[২১০]*

(যিশাইয়), ইয়ারমিয়াহ (যিরমিয়), হাযকী ইল (যিহিস্কেল), অমূস (আমোষ) ও আরো কয়েকটি সহীফার অধিকাংশ স্থান পড়ার পর মানুষের হৃদয় নেচে উঠে। এগুলোর মধ্যে খোদায়ী কালামের সুস্পষ্ট মাহাত্ম অনুভূত হয়। এগুলোতে শিরকের বিরুদ্ধে জিহাদ, তাওহীদের সপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি প্রদান এবং বনী ইসরাঈলের নৈতিক অধপতনের ওপর কড়া সমালোচনা পড়ার সময় একজন সাধারণ পাঠক একথা অনুভব না করে থাকতে পারে না যে, ইঞ্জীলে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ভাষণসমূহ এবং কুরআন মজীদ ও এই সহীফাগুলো একই উৎস থেকে উৎসারিত স্রোতধারা ছাড়া আর কিছুই নয়।

২০৬. অন্যান্য নবীদের ওপর যে পদ্ধতিতে অহী আসতো তা ছিল এই যে, একটি আওয়াজ আসতো অথবা ফেরেশতারা পয়গাম শুনাতেন এবং নবীগণ তা শুনতেন। কিন্তু মূসা আলাইহিস সালামের সাথে একটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। আল্লাহ নিজে তাঁর সাথে কথা বলেন। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এমনভাবে কথাবার্তা হতো যেমন দু'জন লোক

يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۖ وَلَا تَقُولُوا۟ ثَلَـٰثَةٌ ۚ ٱنتَهُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ سُبْحَـٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ ۘ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

*হে আহলি কিতাব! নিজেদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না[২১১] আর সত্য ছাড়া কোন কথা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করো না। মারয়াম পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহর একজন রসূল ও একটি ফরমান[২১২] ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যা আল্লাহ মারয়ামের দিকে পাঠিয়েছিলেন। আর সে একটি রূহ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে[২১৩] (যে মারয়ামের গর্ভে শিশুর রূপ ধারণ করেছিল)। কাজেই তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলদের প্রতি ঈমান আনো[২১৪] এবং "তিন" বলো না।[২১৫] নিবৃত্ত হও, এটা তোমাদের জন্যই ভালো। আল্লাহই তো একমাত্র ইলাহ। কেউ তার পুত্র হবে, তিনি এর অনেক উর্ধে।[২১৬] পৃথিবী ও আকাশের সবকিছুই তার মালিকানাধীন[২১৭] এবং সে সবের প্রতিপালক ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট।[২১৮]*

সামনাসামনি কথা বলে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সূরা 'তা-হা'য় উদ্ধৃত কথোপকথনের বরাত দেয়াই যথেষ্ট মনে করি। বাইবেলেও হযরত মূসার এই বৈশিষ্ট্যটির উল্লেখ এভাবেই করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ "যেমন কোন ব্যক্তি কথা বলে তার বন্ধুর সাথে, ঠিক তেমনি খোদাবন্দ মূসার সাথে সামনাসামনি কথা বলতেন।" (যাত্রা ৩৩ ঃ ১১)

২০৭. অর্থাৎ তাদের সবার একই কাজ ছিল। সে কাজটি ছিল এই যে, যারা আল্লাহর পাঠানো শিক্ষার ওপর ঈমান আনবে এবং সেই মোতাবেক নিজেদের দৃষ্টিভংগী ও কার্যকলাপ সংশোধন করে নেবে তাদের তাঁরা সাফল্য ও সৌভাগ্য লাভের সুখবর শুনিয়ে দেবেন। আর যারা ভুল চিন্তা ও কর্মের পথ অবলম্বন করবে তাদেরকে এই ভুল পথ অবলম্বন করার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে দেবেন।

২০৮. অর্থাৎ এই সমস্ত পয়গম্বর পাঠাবার একটিই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্যটি ছিল এই যে, আল্লাহ মানব জাতির কাছে নিজের দায়িত্ব পূর্ণ করার প্রমাণ পেশ করতে চাইছিলেন। এর ফলে শেষ বিচারের দিনে কোন পথভ্রষ্ট অপরাধী তাঁর কাছে এই ওজর পেশ করতে পারবে না যে, সে জানতো না এবং আল্লাহ যথার্থ অবস্থা সম্পর্কে তাকে অবহিত করার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ দুনিয়ার বিভিন্ন

স্থানে পয়গাম্বর পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন। এ পয়গাম্বরগণ অসংখ্য লোকের নিকট সত্যের জ্ঞান পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন ; কিন্তু এখানে রেখে গেছেন তাঁদের বিভিন্ন কিতাব। মানুষকে পথ দেখাবার জন্য অবশ্যি প্রতি যুগে এ কিতাবগুলোর মধ্য থেকে কোন না কোন কিতাব দুনিয়ায় মওজুদ থেকেছে। এরপর যদি কোন ব্যক্তি গোমরাহ হয়, তাহলে সেজন্য আল্লাহ ও তাঁর পয়গাম্বরকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে না। বরং এজন্য ঐ ব্যক্তি নিজেই অভিযুক্ত হবে। কারণ তার কাছে পয়গাম পৌঁছে গিয়েছিল কিন্তু সে তা গ্রহণ করেনি। অথবা সেইসব লোক অভিযুক্ত হবে যারা সত্য-সঠিক পথ জানতো ; কিন্তু আল্লাহর বান্দাদের গোমরাহীতে লিপ্ত দেখেও তাদেরকে সত্য পথের সন্ধান দেয়নি।

২০৯. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের মালিকের নাফরমানী করে তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ক্ষতি হলে তোমাদেরই হবে।

২১০. অর্থাৎ তোমাদের আল্লাহ অজ্ঞ ও বেখবর নন। তাঁর সাম্রাজ্যে বাস করে তোমরা অপরাধমূলক কাজ কারবার করে যেতে থাকবে আর তিনি এর কোন খবর রাখবেন না, এটা কেমন করে হতে পারে। তিনি নাদান ও মূর্খও নন। তাঁর ফরমান ও হুকুমনামার বিরুদ্ধাচরণ করা হবে আর তিনি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার পদ্ধতিই জানবেন না, এ ধরনের কোন অবস্থা কল্পনাই করা যেতে পারে না।

২১১. এখানে আহলে কিতাব বলতে খৃস্টানদের বুঝানো হয়েছে এবং 'বাড়াবাড়ি' করা অর্থ হচ্ছে, কোন বিষয়ের সমর্থনে ও সহযোগিতায় সীমা অতিক্রম করে যাওয়া। ইহুদীদের অপরাধ ছিল, তারা ঈসা আলাইহিস সালামকে অস্বীকার ও তাঁর বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আর খৃস্টানদের অপরাধ ছিল, তারা ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি ভক্তি, প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

২১২. মূলে 'কালেমা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মারয়ামের প্রতি কালেমা (ফরমান) পাঠাবার অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা মারয়াম আলাইহাস সালামের গর্ভাধারকে কোন পুরুষের শুক্রকীটের সহায়তা ছাড়াই গর্ভধারণ করার হুকুম দিলেন। ঈসা আলাইহিস সালামের বিনা বাপে জন্মগ্রহণ করার রহস্য সম্পর্কে খৃস্টানদের প্রথমে একথাই বলা হয়েছিল। কিন্তু তারা গ্রীক দর্শনের প্রভাবে ভুল পথ অবলম্বন করে। ফলে প্রথমে তারা কালেমা শব্দটিকে 'কালাম' বা 'কথা' (Logos) -এর সমার্থক মনে করে। তারপর এ কালাম ও কথা থেকে আল্লাহ তা'আলার নিজ সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কালাম–গুণ অর্থাৎ আল্লাহর কথা বলা বুঝানো হয়েছে। অতপর ধারণা করা হয়েছে যে, আল্লাহর সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট এ গুণটি মারয়াম আলাইহাস সালামের উদরে প্রবেশ করে একটি দেহাবয়ব ধারণ করে এবং তাই ঈসা মসীহের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এভাবেই খৃস্টানদের মধ্যে ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ মনে করার ভ্রান্ত আকীদার উদ্ভব হয়েছে। তাদের মধ্যে ভ্রান্ত বিশ্বাস শিকড় গেড়ে বসেছে যে, আল্লাহ নিজেই নিজেকে অথবা নিজের চিরন্তন গুণাবলী থেকে 'কালাম' ও 'বাক' গুণকে ঈসার রূপে প্রকাশ করেছেন।

২১৩. এখানে ঈসা আলাইহিস সালামকে روح منه (আল্লাহর কাছ থেকে আসা রূহ) বলা হয়েছে। সূরা আল বাকারায় একথাটিকে নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে ঃ ايدنه بروح

القدس (আমি পাক রূহের সাহায্যে ঈসাকে সাহায্য করেছি)। এই উভয় বাক্যের অর্থ হচ্ছে : আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালামকে পাক রূহ দান করেছিলেন। অন্যায় ও পাপাচারের সাথে এই পাক রূহের কোনদিন কোন পরিচয়ই হয়নি। আপাদমস্তক সত্য ও সততা এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র ছিল এর বৈশিষ্ট। খৃষ্টানদের কাছেও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের এই একই পরিচিতি দান করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এর মধ্যেও বাড়াবাড়ি করেছে। روح من الله অর্থাৎ আল্লাহর কাছ থেকে একটি রূহকে তারা বিকৃত করে সরাসরি আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছে। আর "রূহুল কুদুস" (Holy Ghost)–'কে ধরে নিয়েছে "আল্লাহর মুকাদ্দাস বা মহাপবিত্র রূহ", যা ঈসার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। এভাবে আল্লাহ ও ঈসার সাথে রূহুল কুদুসকে তৃতীয় একজন মাবুদ বানিয়ে নেয়া হয়েছিল। এটা ছিল খৃষ্টানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাড়াবাড়ি এবং এর ফলে তারা গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মজার ব্যাপার এই যে, মথি লিখিত ইঞ্জীলে আজো এ বাক্যটি লেখা রয়েছে : ফেরেশ্‌তারা তাকে (অর্থাৎ ইউসূফ নাজ্জারকে) স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললো, "হে ইউসুফ ইবনে দাউদ! তোমার স্ত্রী মারয়ামকে তোমার কাছে নিয়ে আসতে ভয় পেয়ো না। কারণ তার পেটে যে রয়েছে সে রূহুল কুদুসের কুদরাতে সৃষ্টি হয়েছে।" (অধ্যায় ১ : শ্লোক ২০)

২১৪. অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ বলে মেনে নাও এবং সমস্ত রসূলদের রিসালাতের স্বীকৃতি দাও। ঈসা মসীও (আ) তাঁদেরই মধ্যকার একজন রসূল। এটিই ছিল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আসল শিক্ষা। ঈসায়ী সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই যথার্থ সত্য শিক্ষাটি মেনে নেয়া উচিত।

২১৫. অর্থাৎ তিন ইলাহের আকীদা তোমাদের মধ্যে যে কোন আকৃতিতে বিদ্যমান থাক না কেন তা পরিহার করো। আসলে খৃষ্টানরা একই সংগে একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ উভয়টিই মানে। ইঞ্জীলগুলোতে মসীহ আলাইহিস সালামের যে সমস্ত সুস্পষ্ট বাণী পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে কোন একজন খৃষ্টানও একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, আল্লাহ এক এবং তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন ইলাহ নেই। তাওহীদ যে দীনের মূলকথা এটা স্বীকার না করে তাদের উপায় নেই। কিন্তু শুরুতেই তাদের মনে এই ভুল ধারণার জন্ম হয়েছিল যে, আল্লাহর কালাম ঈসার রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং আল্লাহর রূহ তাঁর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। এই ভুল ধারণার কারণে তারা সমগ্র বিশ্ব–জাহানের মালিক আল্লাহর সাথে ঈসা মসীহ ও রূহুল কুদুসের (জিব্রীল) খোদায়ীকেও মেনে নেয়াকে অযথা নিজেদের জন্য অপরিহার্য গণ্য করেছে। এভাবে জোরপূর্বক একটি আকীদা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নেবার কারণে একত্ববাদে বিশ্বাসের সাথে সাথে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস আবার ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসের সাথে সাথে একত্ববাদে বিশ্বাসকে কিভাবে একই সংগে মেনে চলা যায়, এটা যথার্থই তাদের জন্য রহস্যময় ও জটিল হয়ে উঠেছে। প্রায় আঠার শো বছর থেকে খৃষ্টান পণ্ডিতগণ নিজেদের সৃষ্ট এই জটিলতার গ্রন্থী উন্মোচন করার জন্য মাথা ঘামিয়ে চলেছেন। এরি বিভিন্ন ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বহু দল উপদল গঠিত হয়েছে। এরি ভিত্তিতে একটি দল অন্য দলকে কাফের বলে প্রচার করেছে। এই বিবাদের ফলে গীর্জার সংহতি বিনষ্ট হয়েছে। এবং বিভিন্ন গীর্জা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। তাদের আকায়েদ ও যুক্তি শাস্ত্রের সমস্ত শক্তি এরি পেছনে ব্যয়িত হয়েছে। অথচ এ জটিল সমস্যাটি আল্লাহ সৃষ্টি

لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾

২৪ রুকূ'

*মসীহ কখনো নিজের আল্লাহর এক বান্দা হবার ব্যাপারে লজ্জা অনুভব করে না এবং ঘনিষ্ঠতর ফেরেশতারাও একে নিজেদের জন্য লজ্জাকর মনে করে না। যদি কেউ আল্লাহর বন্দেগীকে নিজের জন্য লজ্জাকর মনে করে এবং অহংকার করতে থাকে তাহলে এক সময় আসবে যখন আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে নিজের সামনে হাযির করবেন। যারা ঈমান এনে সৎকর্মনীতি অবলম্বন করেছে তারা সে সময় নিজেদের পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো প্রতিদান দেবেন। আর যারা বন্দেগীকে লজ্জাকর মনে করেছে ও অহংকার করেছে, তাদেরকে আল্লাহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ ছাড়া আর যার যার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার ওপর তারা ভরসা করে, তাদের মধ্যে কাউকেও তারা সেখানে পাবে না।*

করেননি। তাঁর প্রেরিত ঈসা মসীহও এ সমস্যাটি সৃষ্টি করেননি। আবার আল্লাহকে তিন মেনে নিয়ে তাঁর একত্ববাদের গায়ে কোন আঁচড় না লাগানো কোনক্রমে সম্ভব নয়। শুধুমাত্র তাদের বাড়াবাড়ির কারণেই এই জটিল সমস্যাটির উদ্ভব হয়েছে। কাজেই বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকাই এর একমাত্র সমাধান। এ জন্য তাদের পরিহার করতে হবে ঈসা মসীহ ও রূহুল কুদুসের ইলাহ ও মাবুদ হবার ধারণা। একমাত্র আল্লাহকেই একক ইলাহ হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং মসীহকে কেবলমাত্র তার পয়গাম্বর গণ্য করতে হবে, তাঁর খোদায়ীতে তাকে কোন প্রকারে শরীক করা যাবে না।

২১৬. এটি হচ্ছে খৃষ্টানদের চতুর্থ বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের বর্ণনা যদি সঠিক হয়েও থাকে তাহলে তা থেকে (বিশেষ করে প্রথম তিনটি ইঞ্জীল থেকে) বড়জোর এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, মসীহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ ও বান্দার

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٤﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿١٧٥﴾

*হে লোকেরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে উজ্জল প্রমাণপত্র এসে গেছে এবং আমি তোমাদের কাছে এমন আলোক রশ্মি পাঠিয়েছি যা তোমাদের সুস্পষ্টভাবে পথ দেখিয়ে দেবে। এখন যারা আল্লাহর কথা মেনে নেবে এবং তার আশ্রয় খুঁজবে তাদেরকে আল্লাহ নিজের রহমত, করুণা ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নেবেন এবং নিজের দিকে আসার সোজা পথ দেখিয়ে দেবেন।*

সম্পর্ককে বাপ ও বেটার সম্পর্কের সাথে তুলনা করেছিলেন। আর "বাপ" শব্দটি তিনি আল্লাহর জন্য নিছক উপমা ও রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন, যাতে এই সম্পর্ক বুঝা যায়। আসল অর্থে এটিকে ব্যবহার করেননি। এটা কেবলমাত্র ঈসা আলাইহিস সালামের একার বৈশিষ্ট নয়। প্রাচীন যুগ থেকে বনী ইসরাঈলরা আল্লাহর জন্য বাপ প্রতিশব্দটি ব্যবহার করে আসছে। বাইবেলের ওল্‌ড টেষ্টামেন্টে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। ঈসা আলাইহিস সালাম নিজের কওমের মধ্যে প্রচলিত বাকধারা অনুযায়ী এ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি আল্লাহকে কেবলমাত্র নিজের নয় বরং সমস্ত মানুষের বাপ বলতেন। কিন্তু খৃষ্টানরা এখানে এসে আবার বাড়াবাড়ি করেছে। তারা মসীহকে আল্লাহর একমাত্র পুত্র গণ্য করেছে। এ ক্ষেত্রে তারা যে অদ্ভুত মতবাদ পোষণ করে তার সারনির্যাস হচ্ছে ঃ যেহেতু মসীহ আল্লাহর বহিঃপ্রকাশ এবং তার কালেমা ও তাঁর রূহের শারীরিক কাঠামো, কাজেই তিনি আল্লাহর একমাত্র পুত্র। আর আল্লাহ তার একমাত্র পুত্রকে এ উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন যে, তিনি মানুষের গোনাহ নিজের মাথায় নিয়ে শূলে চড়ে প্রাণ দেবেন এবং নিজের রক্তের বিনিময়ে মানুষের গোনাহের কাফ্‌ফারা আদায় করবেন। অথচ মসীহ আলাইহিস সালামের কোন বাণী থেকে তারা এর কোন প্রমাণ পেশ করতে পারবে না। এ আকীদাটি তাদের নিজেদের তৈরী করা। তারা নিজেদের পয়গাম্বরের মহান ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে যে বাড়াবাড়ি করেছে এটি তারই ফলশ্রুতি।

আল্লাহ এখানে কাফ্‌ফারা সম্পর্কিত বিশ্বাসের প্রতিবাদ করেননি। কারণ এটা খৃষ্টানদের কোন স্বতন্ত্র ও স্থায়ী বিশ্বাস নয়। বরং এটা হচ্ছে মসীহকে (আ) আল্লাহর পুত্র গণ্য করার পরিণতি এবং 'যদি মসীহ আল্লাহর একমাত্র পুত্রই হন তাহলে তিনি শূলবিদ্ধ হয়ে লাঞ্ছিতের মৃত্যুবরণ করলেন কেন' এ প্রশ্নের একটি দার্শনিক ও মরমীয় ব্যাখ্যা। কাজেই যদি মসীহ আলাইহিস সালামের আল্লাহর পুত্র হবার ধারণার প্রতিবাদ করা হয় এবং তাঁর শূলবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা সম্পর্কিত ভুল ধারণা দূর করা যায় তাহলে আপনা আপনিই এ বিশ্বাসের প্রতিবাদ হয়ে যায়।

يَسْتَفْتُوْنَكَ ۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ۚ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

*লোকেরা[২১৯] তোমার কাছে পিতা-মাতাহীন নিসন্তান ব্যক্তির[২২০] ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করছে। বলে দাও, আল্লাহ তোমাদের ফতোয়া দিচ্ছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি নিসন্তান মারা যায় এবং তার একটি বোন থাকে,[২২১] তাহলে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। আর যদি বোন নিসন্তানা মারা যায় তাহলে ভাই হবে তার ওয়ারিস।[২২২] দুই বোন যদি মৃতের ওয়ারিস হয়, তাহলে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশের হকদার হবে,[২২৩] আর যদি কয়েকজন ভাই ও বোন হয় তাহলে মেয়েদের একভাগ ও পুরুষদের দুইভাগ হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট বিধান বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বিভ্রান্ত না হও এবং আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে জানেন।*

২১৭. অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশের অস্তিত্ব সম্পন্ন কোন জিনিসের সাথেও আল্লাহর পিতা-পুত্রের সম্পর্ক নেই। বরং এ সম্পর্ক হচ্ছে মালিক ও তার মালিকানাধীন বস্তুর।

২১৮. অর্থাৎ নিজের খোদায়ীর ব্যবস্থাপনা করার জন্য আল্লাহ নিজেই যথেষ্ট। তার কারো কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই। কাজেই এ জন্য কাউকে পুত্র বানাবারও তার কোন দরকার নেই।

২১৯. এ সূরাটি নাযিল হওয়ার অনেক পরে এ আয়াতটি নাযিল হয়। কোন কোন হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এটি কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। এ বর্ণনাটি সঠিক না হলেও কমপক্ষে এতটুকু প্রমাণিত যে, এ আয়াতটি নবম হিজরীতে নাযিল হয়। এর অনেক পূর্বে সূরা নিসা নাযিল হয় এবং তাকে একটি স্বতন্ত্র সূরা হিসেবে তখন পাঠ করা হচ্ছিল। এ জন্যই মীরাসের বিধান বর্ণনার উদ্দেশ্যে সূরার শুরুতে যে আয়াতগুলো বর্ণনা করা হয় তার সাথে এ আয়াতটি বর্ণিত হয়নি বরং পরিশিষ্ট হিসেবে সূরার শেষে একে রাখা হয়েছে।

২২০. মূল বাক্যে কালালা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'কালালা' শব্দের অর্থের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে কালালা হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যার সন্তান নেই

এবং যার বাপ–দাদাও বেঁচে নেই। আবার অন্যদের মতে যে ব্যক্তি নিছক নিসন্তান অবস্থায় মারা যায় তাকে কালালা বলা হয়। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শেষ সময় পর্যন্ত এ ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে প্রথমোক্ত লোকটিকেই কালালা বলা হয়। সাধারণ ফকীহগণ তাঁর এই মত সমর্থন করেছেন। কুরআন থেকেও এই মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ কুরআনে কালালার বোনকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক বানানো হয়েছে। অথচ কালালার বাপ বেঁচে থাকলে বোন সম্পত্তির কিছুই পায় না।

২২১. এখানে এমন সব ভাইবোনের মীরাসের কথা বলা হচ্ছে যারা মৃতের সাথে মা ও বাপ উভয় দিক দিয়ে অথবা শুধুমাত্র বাপের দিক দিয়ে শরীক। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু একবার তাঁর এক ভাষণে এই অর্থের ব্যাখ্যা করেছিলেন। কোন সাহাবা তাঁর এই ব্যাখ্যার সাথে মতবিরোধ করেননি। ফলে এটি একটি সর্বসম্মত মতে পরিণত হয়েছে।

২২২. অর্থাৎ ভাই তার সমস্ত সম্পদের ওয়ারিশ হবে, যদি কোন নির্দিষ্ট অংশের অন্য কোন অধিকারী না থেকে থাকে। আর যদি নির্দিষ্ট অংশের অন্য কোন অধিকারী থাকে—যেমন স্বামী তাহলে প্রথমে তার অংশ আদায় করার পর অবশিষ্ট পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভাই পাবে।

২২৩. দু'য়ের বেশী বোন হলে তাদের সম্পর্কেও এই একই বিধান কার্যকর হবে।

---